শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চা

-জ্যোতি পোদ্দার

এই উত্তর জনপদের টাউন শেরপুরে ছোটকাগজ চর্চার ইতিহাস খুব বেশি দিনের না। দেশভাগের আগে এখানকার সামন্ত জমিদারদের নিজস্ব পত্রিকা ছিল, ছিল প্রেসও। যত না বাণিজ্যের কারণে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন—তার চেয়ে অধিকতর দৃষ্টি ছিল শিল্প-সাহিত্য চর্চার পরিসর নির্মাণ করা।

যে সময়ে শেরপুরে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয়, তখন টাউন শেরপুর নিতান্তই প্রান্তিকের প্রান্তিক—এক পাণ্ডববর্জিত অঞ্চল। তবু এখানে 'বিদ্যোন্নতি সাহিত্য চক্র' গঠিত হয়ে গেছে, বেরুচ্ছে মাসিক 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী' (১৮৬৫)—সামন্ত জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর প্রযত্নে বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায়। অন্যদিকে, জগন্নাথ অগ্নিহোত্রির সম্পাদনায় 'বিজ্ঞাপনী' (১৮৬৬)।

প্রান্তিকের প্রান্তিক টাউন শেরপুর হতে দুই দুটি পত্রিকা বের হচ্ছে। চাট্টিখানি কথা নয়। পত্রিকা থাকবে আর গ্রাহক পাঠক থাকবে না—তেমন তো হতে পারে না। কাজে কাজে মূদ্রন যন্ত্র স্থাপন করে পাঠকের সাথে সম্পর্কায়ন দ্রুততর করা। প্রথম দিকে ঢাকা থেকে ছাপিয়ে আনতে হতো। এতে সময় ও অর্থ—দুটিই বাঁচে। শিল্প সাহিত্য দর্শন চর্চার পরিসর বাড়িয়ে দেবার যে আকুলতা সামন্ত হরচন্দ্র চৌধুরী ভেতর ছিল তাকেই অধ্যাপক মোস্তফা কামাল বলেছেন, 'এখানেই শিল্পী হরচন্দ্র চৌধুরী সামন্ত হরচন্দ্রকে পরাজিত করে স্বাধীন শৈল্পিক সত্তায় জাগ্রত ও স্পষ্টবাক।'[৪]

সামন্ততন্ত্রের গভীরে তখন নয়ানী জমিদার ও পৌনে তিন আনি জমিদারদের ভেতর যেমন শরিকি হিস্যা ঈর্ষা দ্বেষ বাড়ছিল, একই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল কল্যাণমুখী নানা কাযকার। একপক্ষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তো আরেক পক্ষ বছর না-ঘুরতেই আরেকটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তেমন পাল্লা দিয়ে পারিবারিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা বা পত্রিকা প্রতিষ্ঠা। এই পাল্টাপাল্টির ভেতরই জন্মগ্রহণ করেন জন্মে হিরন্ময়ী দেবী। তিনিই এই উত্তর জনপদের প্রথম নারী কবি হিরন্ময়ী দেবী চৌধুরী। ১৯২১ সালে 'পুস্পাধার' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যদিও.... 'পুস্পাধার সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইল না'[২৫] বইটির ভুমিকা লেখেন আড়াইআনী জমিদার শ্রী গোপাল দাস চৌধুরী।

প্রথম পত্রিকা 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী' প্রকাশের চার বছর পর ১৮৬৯ সালে টাউন শেরপুর পৌরসভা ঘোষিত হয়। ময়মনসিংহকেও একই বছর পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এপ্রিল আটে ময়মনসিংহ, জুনের ষোল শেরপুর।

নিশ্চয় এই প্রান্তিকের প্রান্তিক ব্রিটিশের অর্থনৈতিক সূচকে শেরপুর তখন রাইজিং জোন—রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতির স্পেস বিদ্যমান ছিল।

এই আর্থসামাজিক বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে আরো যতটুকু শেরপুরের বিকাশ ও বিস্তরণের দরকার ছিল, ততটুকু বলতে গেলে হয়নি। কেন হয়নি তার কার্যকারণ ও পর্যালোচনা—যোগ্য কোনো সমাজতত্ত্ববিদ করবেন, সেই ক্ষেত্র আমার না। দেশভাগ পূর্বের দালিলিক প্রমাণপত্র পেতে আমাদের হাত পাততে হচ্ছে হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'সেরপুর বিবরণ' (১৮৭২), অথবা বিজয় চন্দ্র নাগের 'নাগ বংশের ইতিহাস' (১৯২৭), অথবা হাল আমলে প্রকাশিত নয় আনী জমিদার বাড়ির উত্তরধিকার গোপা হেমাঙ্গী রায়ের 'সোনার খাঁচার দিনগুলো' (২০০৪) উপর।

স্থানিক কোনো আর্কাইভ বা পুরাতন পাঠাগার না-থাকার (ইতিহাস চেতনা না-থাকার কারণে কালের প্রকোপে অথবা কর্তা ব্যক্তিদের অবহেলায় ধ্বংশ হয়ে গেছে) দরুণ তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত কোনো পত্রিকা বা স্মরণিকা আমাদের হাতে নেই। থাকলে হয়তো টাউন শেরপুরের যাত্রা পথটুকু বেশ ভালোভাবেই জানা যেত। পরবর্তী সময়ে যারা টাউন শেরপুরে নিয়ে কাজ করেছেন, যেমন—অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন, পণ্ডিত ফসিহুর রহমান বা হাল আমলে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ—তারা কেউই ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত টাউন শেরপুরে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোনো দালিলিক তথ্যাদি হাজির করেননি, কোথাও কোথাও ঘটনার তারিখ লিখেই ইতিহাসচর্চার কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন।

তবে যতটুকু তাদের সামর্থ্য (একক ব্যক্তি কতটুকুই আর করতে পারে!), ততটুকু দিয়ে তারা তাদের কাজ সম্পন্ন করে গেছেন। শুরু তারা করে গেছেন—এখন বাকি মিসিংলিংক সন্ধান ও পর্যালোচনার করে যোগসূত্র স্থাপন। এভাবেই তৈরি হবে অতীতের সাথে বর্তমানের সংযোগ সড়ক। তার দায় ভাগ এই প্রজন্মের!

স্থানিকে সমাজ কারিগরিদের সম্মান জানানো এবং তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেবার এই একমাত্র পথ—তাদের নানামুখী কাজের ভাবের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করে পর্যালোচনা করা, তাদের সময় ও কাজের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার পরিসর সৃষ্টি করা।

স্থানিক ইতিহাসের উপাত্ত সংগ্রহ বিশ্লেষণ করে যথাযথ ভিত্তি রচনা ছাড়া জাতীয় ইতিহাস বিকাশ লাভ করে পারে না। ইতিহাস শুধুমাত্র কতিপয় তারিখ আর গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষের নাম নয়। নয় জলাবদ্ধ পুকুরের ভাগাড়—ইতিহাস একটি জীবন্ত ব্যাপার।

যা আমরা হারিয়েছি তা তো গেছেই কালের গর্ভে যতটুকু এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে—হোক না ধর্ম কিংবা শিল্প সাহিত্য

সংস্কৃতি রাজনীতি বা পরিবার সমাজ ক্ষেত্র—তার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ রাখা—ভাবী কালের সমাজভাবুকদের জন্য।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই যতটুকু সম্ভব টাউন শেরপুরের ছোটকাগজ চর্চার হদিস আনা বা উপাত্ত হিসেবে হাজির রাখা। সব যে পেয়েছি সেই দাবি করব না—যতটুকু পেয়েছি হোক সে স্মরণিকা ভাঁজপত্র স্কুল কলেজের বার্ষিকী বা সাহিত্য পত্রিকা কিংবা নানা সংগঠনের সংকলন—সকলকে 'ছোটকাগজ' ডাক নামে একত্রে হাজির করা।

একে অপরের যোগসূত্রতা বা বিচ্ছিন্নতা তুলে ধরা—কিংবা বলা যেতে পারে প্রকাশিত নতুন পুরাতন ছোটকাগজ একজন পাঠকের এক ধরনের পাঠ ও পাঠোত্তরে টুকিটাকি মন্তব্য এবং লিখিয়েদের নানা কথাবার্তার সময়ের লেখচিত্র মাত্র।

দেশ ভাগ উত্তর তরুণ সুশীল মালাকার হাতে লেখা পাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর' (১৯৫৭) দিয়েই টাউন শেরপুরে ছোটকাগজের যাত্রা শুরু। সহ সম্পাদক অধির দাসকে নিয়ে 'বছর খানিক ধরে' প্রকাশিত হয়েছিল।

ষাটের দশকের শেষদিকে সুশীল মালাকার ও মোজ্জামেল হকের যৌথতায় সাহিত্য পত্রিকা মাসিক 'দখিনা' (১৯৬৭) বের হয় নিউ প্রেস থেকে। এটিই টাউন শেরপুরে ছাপা পত্রিকার যাত্রা বিন্দু—এইটুকুই তথ্য হিসেবে হাজির।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭-এর মধ্যে 'কিশোর' ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্য পত্রিকা বা স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে কিনা তার দালিলিক তথ্যাদি আপাতত পাওয়া যায়নি। হয়তো হয়েছে হয়তো-বা না। এতটুকু মেনেই ১৯৭০ সাল থেকেই তথ্যাদি সূত্রাবদ্ধ করতে থাকি।

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন তাদের আর্দশিক লড়াই শুধু মিছিল বা মিটিংয়ের ভেতর সীমাবদ্ধ না-রেখে বিভিন্ন দিবসভিত্তিক স্মরণিকা প্রকাশের ভেতর দিয়েও চর্চা করে গেছে। এখনকার ছাত্র রাজনীতির রূপ যাই হোক না কেন—স্বাধীনতার আগে-পরে ছাত্র সংগঠনগুলো স্মরণিকা প্রকাশকে হাতিয়ার করেছে।

শিল্প-সাহিত্য-দর্শন চর্চার ভেতর দিয়ে রাজনৈতিকতার চর্চা করেছে। টাউন শেরপুরে এই দুটি সংগঠনের স্মরণিকাগুলো : আবাহন (১৯৭০), লাল পলাশ (১৯৭০), সূর্য্য অন্বেষা (১৯৭০), রক্তের স্বাক্ষর(১৯৭১), ওরা মরণজয়ী (১৯৭২), স্পন্দিত শোনিত (১৯৭৩), অগ্রণী (১৯৭৩), অঞ্জন (১৯৭০), ঘোষণায় আমরা (১৯৭২), নন্দিত নবীন (১৯৭৪)।

শেরপুরে শ্রমিক সংগঠনও সাহিত্য পত্রিকা করেছে। সাতের দশকের শেষের দিকে মূলত জাসদের প্রভাব বলয়ে এই শ্রমিক সংগঠনগুলো গড়ে ওঠেছে। সমর্পন (১৯৭৯) প্রলেতারিয়েত (১৯৮০) শ্রমিকদের মে দিবসের পত্রিক। এ ছাড়া জাসদ ছাত্রলীগ তাহেরের ফাঁসির পর আরো দুটি স্মরণিকা বিস্ফোরণ (১৯৮০) লাল সালাম (১৯৮০) প্রকাশ করে।

গোষ্ঠীভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা শুরু করে কৃষ্টি প্রবাহ। সাহিত্যচর্চা তাদের লক্ষ ছিল না। ছিল গান নাটক নৃত্য ইত্যাদি চর্চা ভিত্তিক কার্যক্রম। বিভিন্ন সময়ে তারা বুলেটিন বা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলে কবিতা বা গল্প নিবন্ধ নিয়েই প্রকাশ পেতো। স্থানিকের বৈশিষ্ট্যই এমন। প্রবাহ (১৯৭৪) তাদের নিজস্ব কাগজ।

শহীদ মোস্তফা থিয়েটার নানা তৎপরতার ভেতরও নাট্য বিষয়ক কাগজ 'নাট্যপত্র' (২০১০) প্রকাশ করে। অন্যদিকে, উদীচী আর্দশভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। আটের দশকেই শেরপুরে তাদের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

উদীচী নির্দিষ্ট লক্ষ-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আজো শেরপুরসহ সারাদেশে সমাজ রূপান্তরের জন্য সাংস্কৃতিক লড়াই সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের মুখপত্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে বের হয়েছে। যে ক'টি পাওয়া গেছে—ব্রজে বাজে বাঁশী(১৯৮৬), অঙ্গিকার (১৯৮৫), মৃৎ(২০০৮), ইস্ক্রা (১৯৮৫), প্রস্তুতি (১৯৮৬), ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল(১৯৮৮), রক্তপদ্ম(১৯৮৩) ইত্যাদি।

'পাতাবাহার' দুলাল দে বিপ্লবের প্রতিষ্ঠিত শিশু কিশোর সংগঠন। ১৯৭২ সালে যুদ্ধ থেকে ফিরেই দুলাল দে এই খেলাঘরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী যে প্রতিরোধ যুদ্ধের ডাক দেন—এই শেরপুর অঞ্চলে অনেকের মতো তিনিও সেই যুদ্ধে অংশ নেন এবং জামালপুরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন।

স্থানিকে কর্মতৎপরমুখী এই খেলাঘরের সাময়িকীগুলো হলো—প্রতিধ্বনি(১৯৮৯), অঙ্গিকার(!), চেতনা(১৯৭৭)। এ ছাড়া বৈতালিক কচিকাঁচার বার্ষিক মুখপত্র—কচিকাঁচা (১৯৮৫), আর শিশুদের জন্য শিশুদের পত্রিকা 'দুরন্ত'(১৯৮৮)-ই একমাত্র টাউন শেরপুরে শিশুতোষ পত্রিকা, যেখানে সম্পাদকদ্বয় যথেষ্ট মাঠ প্রস্তুতি করেই শুরু করেছিলেন, কিন্তু গোটা তিনেকের পর হাল ছাড়তে হলো।

শেরপুর সাহিত্য পরিষদ গঠনে কবি আবদুর রেজ্জাক অনুঘটকের ভুমিকা পালন করেছেন। অগ্রজ এই কবি দীর্ঘদিন সাংগঠনিক তৎপরতার ভেতর দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন। বিভিন্ন নামে কাগজ করলেও, 'কালিক' ছিল তাঁর সম্পাদিত সবচেয়ে ভালো একটি সাময়িকী। এ ছাড়া, উচ্চারণ (১৯৮২), কালিক (১৯৯৩), অন্বেষা (১৯৮১), স্বরনিকা(১৪১০), স্পন্দন (১৪০২)।

তা ছাড়া কলতান গোষ্ঠীসহ আরো কয়েকটি সংগঠনের নিয়মিত-অনিয়মিত ছোটকাগজগুলো হলো—আমরা তোমারই সন্তান (১৯৯১), সমর্পন (১৯৭৯), বিজয় কেতন (১৯৮৩), ক্ষোভ (১৯৮১), অংকুর (১৯৯০), কংস(১৯৯০), অনুশীলনী (১৯৯২), ধী (১৯৯২), বালার্ক (১৯৯৯), রক্ত ঝরা একাত্তর(১৯৯৫), বিহান(২০১৮)।

গত শতকের আটের দশক টাউন শেরপুরে যেমন একের পর এক সাহিত্য গোষ্ঠীর জন্ম নিয়েছে, তেমনি মৃত্যু ও অপুষ্টির হারও উর্ধ্বমুখী। চিন্তার জাড্যতা ও অধিকতর সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং শুধু কমিটি সর্বস্ব সাহিত্য গোষ্ঠী হবার কারণে টিকে থাকতে পারেনি।

তবে একমাত্র বিহঙ্গ সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রযত্নে প্রকাশিত 'মানুষ থেকে মানুষে'(১৯৮০) কাগজটি ধারাবাহিক প্রকাশের ভেতর দিয়ে তারা তাদের নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন।

টাউন শেরপুরে লাইব্রেরির চলার পথ ১৯২৬ থেকে। রিডিং ক্লাব নামে প্রতিষ্ঠিত সেই সময়ে 'টাকা ডিপোজিট' রেখে গ্রাহক বাড়িতে বই নিয়ে যাবার প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যে যাত্রা শুরু—সেটিই আজকের খান বাহাদুর ফজলুল রহমান জেলা সরকারি গ্রন্থাগার।

আটের দশকে কয়েকজন উদ্যোগী সংস্কৃতজন গ্রন্থাগারের পক্ষে 'উচ্চারণ' (১৯৮৬) নামে একটি চমৎকার সাময়িকী প্রকাশ করেন। নির্দিষ্ট প্রান্তিকে বের হবার প্রতিশ্রুত হলেও, 'উচ্চারণ' আর উচ্চারিত হয়নি।

দীর্ঘদিন বোবা কালা হয়ে পড়ে থেকে অবশেষে সাংবাদিক হাকিম বাবুলের তৎপরতায় জেলা প্রশাসক মো. নাসিরুজ্জামানের প্রযত্নে আবারো গ্রন্থগার 'ধ্বনি-১' (২০১০) ধ্বনিত হলেও, পুষ্টির অভাবে এখন আর কোনো স্বর ও সুর নেই।

তবে আশার কথা, বর্তমান গ্রন্থাগারিক সাজ্জাদুল করিম নানামুখী কর্মতৎপরতা চালিয়ে গ্রন্থগারটি পাঠকবান্ধব করে গড়ে তুলছেন। তিনিও মনে করেন, 'পাঠাগারকে আরো উচ্চকিত করতে হলে পাঠাগারের নিদিষ্ট সাময়িকী থাকা দরকার—হোক সে মুদ্রিত কিংবা ওয়েব ম্যাগ—অথবা দুটোই।'

সাহিত্য পত্রিকার লড়াই কেউ কেউ ভাবেন নিতান্তই ব্যক্তি উদ্যোগ কেন্দ্রিক। এতে সামষ্টিকের ঝামেলা নাই। স্বাধীনতার স্পেস বাড়ে। ব্যক্তিদিশাই পত্রিকার চরিত্র ঠিক করে। সম্পাদকের ভাব ভাবনার রূপায়নের জন্য এখানে রয়েছে প্রশস্ত পথ। আবার এখানে দায়ও ষোল আনা। ঝুঁকি বন্টনের সুযোগ নেই।

হয় রাগী যুবকের ত্যাড়ামী নিয়ে এগিয়ে যাও—তোমার হাতিয়ার নিয়ে নানা ঘটনাকে প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করে জারি রাখো রাজনৈতিকতা অথবা এক সংখ্যার পর আর্থিক বোঝা ঘাড়ে নিয়ে রণে ভঙ্গ দাও।

আর সম্পাদকের তকমা গায়ে মেখে গেয়ে বেড়াও, 'হ্যাঁ আমি একটি কাগজ করি। শীঘ্রই বের করব। লেখা সংগ্রহ করছি।' লেখা সংগৃহীত হতেই থাকে হতেই থাকে, কাগজ আর বের হয় না।

দ্বিতীয় দলেই পড়ে স্থানিকের অধিকাংশ সম্পাদকেরা। যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রথমার জন্য জীবনপাত করে, প্রকাশের পর দ্বিতীয়ার দিকে টান আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে। এই প্রবণতাই স্থানিক ছোটকাগজ চর্চার প্রবণতা। তাই বলে সবাই না। ঘাড় ত্যাড়া কেউ কেউ একা একা হাঁটে বহুদূর।

যারা স্থানিকে এক সংখ্যা করেই কুড়িতে বুড়িয়ে গেছেন বা ঝরে গেছেন পথের বাঁকে—সেই কাগজ সম্পাদকের কথা কী আমরা তুলব না? তাঁর শ্রম প্রেম ঘাম, চোখের ভেতরে জন্মে নেয়া স্বপ্নের কোনোই মূল্য থাকবে না? তা কী হয়?

তা হতে পারে না। কোনো নিক্তি নিয়ে স্থানিকের ছোটকাগজ আলোচনায় বসিনি। বরং যে কোনো ধরনের নিক্তিকেই সন্দেহের চোখে দেখি। এক বাটখারা দিয়ে সবকিছু যাচাই হয় না। হতে পারে না।

একেক স্থানিকে একেক রঙে রঙিন। তার উচ্চরিত ভাষা খেকে শুরু করে যাপনের সকল ক্ষেত্র আলাদা আলাদা। দেখবার চোখের অভাবে সকলের গায়ে ছড়িয়ে দেই একরূপতার চাঁদর।

আলাদাই সুন্দর। এক বাটখাড়ার চাপে ভাপে তাপে স্থানিকের আঞ্চলিক জন্মদাগ কেবলই ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে মনে হয়। তাতে গুরুত্ব ধরে না, মমত্বও ধরে না। স্থানিকের কবি কেন্দ্রে মুখগুজে স্থানিকের কাজকে মনে করে 'হাত মকশো করার স্মরণিকা'।

একরূপতাই যেন কালের ঈশ্বর। তিনিই কেন্দ্র তিনি পরিধি। এ্যাই শালা আমার আঁকা বৃত্ত ছাড়া অন্য কোনো বৃত্ত নেই। একরূপতার কড়াল গ্রাসে হারিয়ে গেছে বৈচিত্র। স্থানিকের বৈচিত্র দিয়ে ভাষার বৈচিত্র। ভাষাজীবের বহুরৈখিকতা।

যাপনে বহুকৌনিক না-হলে কবিতা গল্প নাটকে নৃত্যতে বহুরৈখিকতা আসে না। আসতে পারে না। স্থানিকের সবিকাশ জরুরি। স্থানিকে আনুভুমিক বিকেন্দ্রিকরণ জরুরি। খাড়াখাড়ি ক্ষমতার বিন্যাস জরুরি। তবেই স্থানিক তাঁরস্বরে কথা কইয়ে উঠবে—সেই স্থানিক হোক না শেরপুর মুন্সিগঞ্জ কিংবা নওগাঁ অথবা পাতরাইল কিংবা নাচোল।

টাউন শেরপুরে ব্যক্তির প্রযত্নে ছোটকাগজ—প্রয়াস (১৯৮৭), রবি রশ্মি (১৯৮৩), কবিতাপত্র (১৯৮৩), বিজ্ঞাপন পত্র (১৯৮৪), বৈশাখী(১৯৮৩), বিষন্ন সৈকতে ভোরের নোঙর (১৯৮৪), এই প্রান্তের সময় স্রোত ও অন্যান্য ১৯৯৯), রক্তের আল্পনা(১৯৮১), আড্ডা(১৯৯২), ময়ূখ(১৯৯৬), সঞ্চরণ (১৯৯১), বর্ষাতি (১৯৯৭), সাহিত্যলোক (১৯৯৩), কনকাঞ্জলি (১৯৭৯), মন্বন্তর(১৯৮০), দৃষ্টি কথা বলবে (১৯৭৯), চতুরঙ্গ' (১৯৭৬), ক (১৯৮৪), রক্ত মাংসের স্বর (১৯৮৩), সূর্করোজ্জ্বল নিজ দেশ (১৯৮৬), ক্ষয় (২০১০), সপ্তডিঙ্গা মধুকর (২০০২), রা (১৯৯৮)।

এই ছোটকাগজগুলো টাউন শেরপুরে সাহিত্যচর্চা চাতাল নির্মাণে সবিশেষ ভুমিকা পালন করেছে। হয়তো কয়েকটি কাগজ একাধিক আলোর মুখ দেখেনি, তবু সূচনা সংখ্যায় নিজের সরব উপস্থিতি জারি রেখেছে।

স্থানিকে পাঠক বলয় যথেষ্ট প্রসারিত নয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো এমন যে, নিজে ও পরিবারের আহার সংস্থানে সকাল-সন্ধ্যা গতরে পরিশ্রমের পর আর ফুসরত কই? পঠন-পাঠনের যে সংস্কৃতি যে আলোড়ন যে ঝোঁক সমাজে দেখা দেবার কথা—সেটি টাউন শেরপুর কেন বাংলাদেশের কোনো মফস্বলের ভাগ্যে জুটে নাই।

সবকিছু সর্বসুখ ঐ রাজধানী ঢাকাতে—এমন মনোভঙ্গির কারণেও, স্থানিক ন্যাতিয়ে আছে ম্যাড় ম্যাড়া হয়ে আছে। সজীবতা নেই। সনদধারী বেড়েছে বটে। স্কুল কলেজ কিন্ডার গার্ডেন

কোচিংয়ের রমারমা; বাজার আছে ক্ষুদ্র ঋণের নামে নানা কিসিমের টাকার দোকান।

তাই বলছিলাম, পঠন পাঠনের সংস্কৃতি গড়ে দেবার যে সামাজিক সাংস্কৃতিক আত্মিক আন্দোলন সেটি মফস্বলে বিস্তার ঘটেনি। রাজনৈতিক টেন্ডার বাজির সাথে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সুচক উর্ধ্বমুখী। জ্ঞান ও জ্ঞানীর সম্মান করতে হবে বলে বইয়ে মুখস্ত করলেও, প্রয়োগে এসে চোরাবালিতে আটকে আছে।

কড় গুণে গুণে বলে দেবার মতো পাঠকের সংখ্যা। কাজে কাজেই ছোটকাগজের বাজার বলতে ঐ গুটি কয়েকজনের করিডোর। কাগজ বিক্রি করতে গেলে কবি ও সম্পাদকের ঘাম ঝরার সাথে সাথে আগ্রহও ঝরে পড়ে মাথা থেকে পায়ে।

তদুপরি আছে কবি ও কবিতা সম্পর্কে অবজ্ঞা-অবহেলা। হোক সে পরিবার কিংবা নাগরিক সুশীলবর্গের। দ্বিমেরু রাজনীতির কারণে সুশীলেরা হালুয়ারুটি একটু ঘুরিয়ে খাবেন, তবু তরুণ কবি ছোটকাগজ নিয়ে টু শব্দ করিবেন না।

পাঠক সমালোচকের পর্যালোচনাই যে তরুণের নতুন দিশা খুলে দিতে পারে—তেমন পাঠক কিংবা সমাজ আমরা 'সৃজন করিতে পারি নাই'।

তিন রাস্তা মোড়ে গলা ফুলিয়ে ঘণ্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা দিতে পারি বটে, কিন্তু কোনোভাবেই চিন্তা চর্চা করবার পাঠচক্র করবার পরিসর তৈরি করবার অবসর কারো হয়নি।

কোথাও কোনো কিছু এমনি এমনি জন্ম-বিকাশ ঘটে না, তার একটা কার্যকারণ থাকে—ফসল ঘরে তোলবার পূর্বে যেমন জমি চাষাবাদের দরকার পরে; তেমনি স্থানিকের বিকাশ সার্বিকতার উপর নির্ভর করে। সেই পরিসর আমাদের কই।

পঠন-পাঠনের সংস্কৃতি গড়ে তুলবার কোনো সামিজিক ফোর্স নাই। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকের এখন 'এ প্লাস'কেই মেনেছে জীবনের সার। স্কুল কলেজ শ্রেণিকক্ষ এখন স্রেফ পরীক্ষা হলো কোচিংই হলো মৌল বিদ্যাপীঠ—ভেতরে শিক্ষার্থী কোচিংয়ের বাইরে কী ভীষণ কাতরতা নিয়ে এখানে ওখানে হত্যে দিয়ে বসে আছে কালের বাবা-মা।

স্কুল-কলেজের পাঠাগার দেখেছেন? গাদাগাদা বইয়ে ঠাসা তার উপর ধুলার পরে ধুলার প্রলেপ। শিক্ষক ব্যাচের পর ব্যাচ টিউশন করিয়ে করিয়ে ক্লান্ত, মুখে আর কোনো রা বেরুই না। সব ক্যালরি শেষ। শিক্ষক রুমে বসে পান চিবাতে চিবাতে একটু ঘুমিয়ে ফুয়েল ভরে নিচ্ছে মাত্র।

এ চিত্র সর্বত্র। হোক সে শহর বন্দর জেলা কিংবা থানা শহর ইউনিয়ন পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র কম-বেশি দেখা দেবে। গ্রাম তো সেই গ্রাম নেই। পাকা রাস্তা। ম্যাইক্রো ক্রেডিট বাংলা। গ্রামীণ আশা ব্র্যাক আপার এ-বাড়ি ও-বাড়ি উঠান বৈঠকে টাকা বেচাকেনায় ব্যস্ত।

তাই বলে স্কুল-কলেজে বার্ষিকী একবারেই হয়নি তা কিন্তু নয়। তবে তা হাতে গোনা। স্কুল-কলেজের দেয়ালিকা ম্যাগাজিন সাহিত্যচর্চার আঁতুর ঘর। সেই চর্চা স্বাধীন বাংলাদেশে বাড়েনি।

দেখভাল করার লোক থাকলেও, এই সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি একধরনের অবজ্ঞা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মনের গভীরে জারি রয়েছে। তবু যে ক'টি এই স্থানিকে পেলাম—বার্ষিকী/৯০, প্রপর্ণ (১৯৯০, ১৯৯৯), উৎস (২০০২), ধারা খরতর (২০১৫), কিশোলয় (১৯৯৮), শুভ্র ভোরের পুষ্পকথা (২০০৭), রজত (২০১৬), ভিক্টোরিয়া (২০১৭) ইত্যাদি।

শিশুদের জন্য কোনো বিনোদনকেন্দ্র নেই। সজীব ফসল ঘরে উঠছে। হোক সে হাইব্রিড। উঠছে পাকা দালান। টাইলস করা হাই-কমোড রো-কমোড বাথরুম। সবই হাল ফ্যাশনের। হোন্ডা চালিয়ে তরুণ শহর যাচ্ছে আড্ডা মারতে নয়তো রাস্তার মোড়ে মাথা গুঁজে নেটে ঘুরছে জগৎ সংসার। এই আমাদের প্রান্তিক জনপদের সাধারণ দৃশ্যবালি।

স্থানিকে ছোটকাগজ বের করবার প্রবণতা পড়তির দিকে। স্থানিক পাঠককে না-পেয়ে কবি-সম্পাদক এখন সিটিজেন ছেড়ে নেটিজেনে। লাইক কমেন্টসের সংখ্যায় গুনে নিচ্ছে কবিতা পড়ার রেটিং। নিউ ফিড আর টাইম লাইনেই স্থানিক কবির রমরমা বাজার।

এই উত্তর জনপদে বেড়ে ওঠা আমাদের ভূমিজরা প্রান্তিকের প্রান্তিক। গারো জনগোষ্ঠী নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্মরণিকা বা ভাঁজপত্র প্রকাশ করছে।

সেখানেও কবিতাচর্চার পরিসর গড়ে ওঠছে। মিঠুন রাকসাম এ অঞ্চলে বেড়ে ওঠা তরুণ কবি। তাঁর কবিতায় উঠে আসছে গারো যাপনচিত্র। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। আপোস ও নির্মম বাস্তবতা। মিঠুনের কবিতায় গারো কথা বলছে। গারোর কথা গারোর কলমেই উঠে আসবে—যে জীবন আমার না সে জীবনের কথা কী করে আমি বয়ান করব? সেই জীবনের জন্য দরকার হয় প্রাঞ্জল সাংমা কিংবা একজন মিঠুন রাকসাম। মিঠুনের গারো কবিতা উচ্চকিত কবিতা।

'বৃদ্ধ নানীর সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি না।

নানী বাংলা জানে কম

আমি মান্দি জানি কম

মুখোমুখি বসে থাকি—বোবা হয়ে যাই।

শালার নিজের ভাষাটাও ভুলে গেলাম।'

(গন্ধচোর : মিঠুন রাকসাম)

থকবিরিম—গারো সাহিত্যের কাগজ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী গারোদের আচিক ভাষা ও সংস্কৃতির বয়ানের কাগজ। মিঠুন রাকমামের প্রযত্নে প্রকাশিত। না, এই প্রকাশনার স্থানিক নয়—ঢাকাতে। হয়তো মিঠুনরা বুঝেছে বাঙালির তাপ চাপ ভাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে বাঙালি রাজধানীতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে

প্রান্তিকের প্রান্তিক লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নিজের ভাষা-সংস্কৃতিকে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

‘থকবিরিম’ মানে বাংলা ভাষান্তরে ‘বর্ণমালা’। থকবিরিম একটি প্রকাশনী সংস্থাও বটে। উদ্দেশ্য ‘গারো ভাষার সাহিত্য, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গারো লোককথা প্রকাশের মাধ্যমে নিজ ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিতকরণ।’

গারো আমাদের পড়শী। এ ভূখণ্ড নির্মাণের কারিগর। বহু রৈখিকতার মেলাবন্ধন অনাদিকালের। দেখাদেখি চাষ লাগালাগি বাসের পড়শী গারো হাজং কোচ বানাই ডালু হদি হিন্দু মুসলিমদের যৌথ যাপনের ভুমিখণ্ড এই উত্তরের জনপদ।

লাগালাগি পাশাপাশি হাত দুরত্বের পড়শী সম্পর্কে জানাশোনা কম। যতটুকু জানাজানি দাপটের জানাজানি। নিজেকে কেন্দ্রে রেখে পরিধিকে জানাজানির মতো। কখনো কালো নেটিভ, জংলি, জমিদারবাবুর এস্টেস্টের বেগার খাটা লোক। অচ্ছুত মান্দি।

কখনো নিজের সাধর্মের শ্রেষ্ঠতার নিরিখে, কখনো ভাষাভাষীর জাতীয়তাবাদের পাটিগণিতের সুদকষার হিসাব সূত্রে মন্দার্থে জানাজানি; নীচুতার নিক্তির মাপমাপি। বাঙালি হবার প্ররোচনায়—এক রৈখিক রেখার পাঠ। অথবা জাতিসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার রাজনৈতিক পাঠ।

কিন্তু কখনো গারো জনগোষ্ঠীর নিজস্বতার নিরিখে যাপনের রসায়ন দিয়ে বুঝতে চাইনি। খুব বেশি গারো কাগজ সংগ্রহ করতে পারিনি। পড়শীর সাথে আমারও কম দূরত্ব নয়। রবেতা ম্রং কিংবা সুদীন চিরান, অথবা প্রাঞ্জল এম সাংমা আমার একমাত্র জানালা—ছোট্ট জানলা। সেখান থেকে সংগৃহীত—ব্রিংনি বিবাল(২০০৯), ওয়ানগালা (১৯৯৯), আসপান (২০১৫) ইত্যাদি প্রপাত্ত রেখেছি পাঠকের জন্য।

ঋদ্ধ হোক থকবিরিম। থকবিরিম নিজস্বতার বিকাশে গেয়ে উঠুক নিজের গান সে বলুক—সকলের সাথে আমার অবারিত যোগ আছে। বৈচিত্র্যই সুন্দর। ক্ষুদ্রই সুন্দর। সংখ্যাধিক্যের খাড়াখাড়ি দাপট নয়; গড়ে উঠুক মানুষের আড়াআড়ি বুনট। পারস্পরিক নির্ভরতার দ্যোতনা।

ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে। চর্চায় নিজে সকলকে ছাড়িয়ে যায়—যেতেও পারে—তাঁর মনোভূমি এক সার্বিকতার ছবি আঁকে। রিলিজিয়নকে একান্ত ব্যক্তিকতার কোঠরে প্রাইভেসির করিডোরে ফেলে দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে খাড়া করবার লড়াই সংগ্রাম—রাষ্ট্র ও ধর্ম কে আলাদা করে—সেকুলারপন্থীকে সংগ্রাম করতে হয়। এ সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রাম। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম। শুধু বাচনিকতা এর বাইরের খোলসমাত্র।

কিন্তু পাশ্চাতের সমাজকাঠমোর বুনন দিয়ে তো আমার সমাজ গঠিত নয়। তার আছে নিজস্ব ধরনধারণ। ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চা করলে বটে, কিন্তু আমাদের পরিবার সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করেনি।

বারো মাসে তেরো পার্বনের রিচুয়াল নিয়েই তার দিনগুজরান করতে হয়—দীর্ঘদিনের সংস্কার অভ্যাস রিলিজিয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠানে তাকে যুক্ত হতে হয়—সমাজের স্বভাব আর প্রভাব দুম করে উঠে যায় না; যেতে পারে না—তার জন্য যে রাজনৈতিক সংগ্রাম সেটি আমরা করে তুলতে পারিনি। এই সংগ্রাম হয়ে ওঠা সংগ্রাম। পুরনো খোলস থেকে বের হয়ে নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণ—সেটি খস করে কাগজে লিখলেই পরিবর্তন হবার নয়।

তার জন্য যে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা তার অভিমুখ এখন বীজাকারে বীজেস্থিত। আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি কোনো আগামী ভবিষ্যৎ।

—যা বলছিলাম। ধার্মিক আয়োজিত অনুষ্ঠান স্যুভিনিয়র বা কোনো স্মরণিকা বের করা নতুন নয়। এটি কখনো গুরুত্বের সাথে দেখা হয়নি। পত্রিকা প্রকাশ রিচুয়ালের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, বরং তরুণ যে উৎসবে মেতে উঠে পুজা সংখ্যা বাহারি উৎসবের গায়ে একটি পালক যুক্ত করার ভেতর দিয়ে উৎসবকে আরেকটু রঙিন করে তোলে, পাশাপাশি মহল্লার তরুণ লিখিয়ে হাত মকশো করার একটা পরিসর পায়। কে জানে হয়তো এই কাগজটিই হতে পারে তরুণের উস্কে দেয়া কাঠি—জ্বলে ওঠতে পারে মুহূর্তে অন্ধকার ভেদ করে।

টাউন শেরপুরে একটা সময় এই চর্চা ছিল। শারদীয়া (১৯৯২), আদ্যা (২০১৪), স্মরণিকা (১৩৯২), দশভুজা (১৯৮৬), অঞ্জলি (১৪১৯), শারদ অর্ঘ্য (১৯৮৭) অন্যত্র দেখিনি। উৎসব উদযাপন পরিষদ এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানানো উচিত।

স্মরণিকার চাতালে যে শুধু সাহিত্যচর্চা হতে পারে তা কিন্তু নয়—ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনাও হতে পারে; হতে পারে পড়শী সংখ্যা গরিষ্ঠ কোনো মানুষ লেখাপত্র। এতে করে সমাজে মানুষে মানুষে আরো একটি ব্রিজিং সৃষ্টি হতে পারে।

শুধু মুখে বকবক করলে ‘সম্প্রীতি’ বজায় থাকে না, নিজের উঠানে অপরকে স্পেস দেবার মনোভঙ্গিও থাকতে হয়, আর তখনই ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার’—কথাটির কার্যক্ষমতা দ্যোতিত হয়। এটি শুধু সনাতনীদের একার চর্চার বিষয় না—দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চর্চার জমিনও বটে।

স্থানিকে উৎসব স্মরণিকা তেমন একটা চাতাল হতে পারে। পুজাসংখ্যা কালেভদ্রে বের হলেও, স্থানিকে ঈদ সংখ্যা কড়ে আঙুলে গোনার মতো অবস্থা। আটের দশকে দুরন্ত চৌধুরী কয়েকবার ঈদুল আজহা সংখ্যা করেছিলেন। বিভিন্ন নামে করলেও ‘আলোড়ন’ নামেই একাধিকবার করেছেন। নয়ের দশকে সুহৃদ জাহাঙ্গীর ‘ঈদ সংখ্যা’ নামে তাঁর নিয়মিত কাগজ ‘আড্ডা’র একবার শুধু নামাঙ্কন করেছিলেন।

‘আলোড়নে’ ধর্ম ধর্মাচারের নানা বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা থাকলেও, ‘আড্ডা’তে শুধু ঈদ সংখ্যা লেখা—এ ছাড়া টাউন শেরপুরে এখানকার সাপ্তহিক দশকাহনীয়, চলতি খবর বা সাপ্তাহিক শেরপুর ঈদ সংখ্যা করবার উদ্যোগ দেখলেও,

ইসলামিক আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত—হোক জড়িত শরিয়তী বা মারফতি—কাউকে ঈদকে কেন্দ্র করে ধর্ম-সাহিত্যচর্চার চাতাল নির্মাণের চেষ্টা দেখিনি।

বড় বড় মিডিয়া হাউজের কথা আমি বলছি না—বলছি কোনো স্থানিকতায় পঠন-পাঠন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বার যে মামলা মোকদ্দমা—আমি তার কথা বলছি। স্থানিকের অনাবাদী জমিন কর্ষণ না-করলে কোনো সোনাই ফলবে না। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে আমিনের মাপা জমির কথাই শুধু বলছি না—বলছি স্থানিকে মনোভূমি কর্ষণ করার কথাও। স্থানিকতার বিনির্মান ছাড়া একটি দেশের আর্থসামাজিক কাঠামো গড়ে উঠতে পারে না।

রাজনীতির কেন্দ্রীভূত নীতি স্থানিককে করে রেখেছে ভাগাড়। তার বিকাশের কোনো পরিসর সে রাখেনি। সংবিধানের পাতা থেকে কথাগুলো বের হয়ে আর পরিধির দিকে আসার সম্ভবনাকে সে করে রেখেছে চুয়ে পড়ার উপনিবেশিক নীতি শৃঙ্খলায়।

প্রকাশ উন্মুখ তরুণের প্রথম চাতাল হচ্ছে ‘ভাঁজপত্র’। কবি যশপ্রার্থীর তরুণের রাখ রাখ ঢাক ঢাক গুড়ের ব্যবস্থাপত্রের নাম ভাঁজপত্র। চারপাতা ভাঁজের ভেতর বন্ধুদের কাঁচালেখা অথবা নিজের ছদ্মনামে একাধিক লেখা প্রকাশের মাধ্যম ভাঁজপত্র।

সহজে কম পয়সায় বের করা যেমন যাচ্ছে, তেমনি সহজে স্মৃতি থেকে হারিয়েও যাচ্ছে—এমনকি প্রকাশিত কপিটিও পাবার জো নেই। টাউন শেরপুরে ভাঁজপত্র—ইস্ক্রা (১৯৮৫), কবিতার কাগজ (১৯৮৯), ছাপ (১৯৯২), চিত্রচেতনা (১৯৮৬), সুড়ঙ্গ (২০০৮), উপমা(২০০৮), উত্তরণ (২০০৫), আর্তনাদ(২০১৭), মুহিম নগরের ট্রেন (২০১৮), দিপ্তী (২০০৩), সিঁড়ি (২০১১), শুভেচ্ছা (২০০৭), মুক্তি (২০১৬), পদাঙ্ক (২০০৬), মধুকর (২০১৯), আলোর মিনার (২০১৯), মুক্ত বিহঙ্গ (২০১১), পদ্মপাণি (২০১৮) ইত্যাদি প্রকাশিত ভাঁজপত্র।

দেয়ালিকার চল একেবারেই উঠে গেছে। শ্রেণি শিক্ষকের উদ্দীপনায় মেতে ওঠা শিক্ষার্থীদের দিবসকেন্দ্রিক তৎপরতা। সুন্দর হাতের লেখা আর বাহারি রঙের কাজ করা দেয়ালিকা যখন স্কুলমাঠে কিংবা দেয়ালে ঝুঁলে—তা দেখার আনন্দ আজকাল শিক্ষার্থী পাচ্ছে কি? খুব কম স্কুলেই দেয়ালিকা হয়। কয়েক বছর আগে টাউন শেরপুরে ‘জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে’ উপলক্ষ আয়োজিত অনুষ্ঠানে দু’টি স্কুলের দেয়ালিকা দেখেছিলাম।

অন্যান্য ক্লাব অথবা পরিবেশবাদী সংগঠন কিংবা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন প্রান্তিকে সাহিত্যচর্চার পরিসর নির্মাণে তৎপরতা লক্ষণীয়। দিবসভিত্তিক যেমন তেমনি সমাজ সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেও গড়েছে সংগঠন। ‘অরুনোপল’ তেমনি একটি সংগঠন। এক স্বপ্নবাজ তরুণ—রমিজুল ইসলাম লিসানের ব্রেইনচাইল্ড—অরুনোপলে। এদের মুখপাত্র সাহিত্য সংস্কৃতির সমাহার ‘উৎস্বর্গ।’

কিন্ত বেদনা এই যে, লিসানকে আমরা হারিয়েছি ব্রেইনস্ট্রোকে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারিতে। লিসানের ভেতর বড় এক সংগঠককে আমি দেখেছিলাম। বিকশিত হবার আগেই লিসান চলে গেল। টাউন শেরপুর একজন ভাবী নেতা হারালো।

বিভিন্ন সংগঠনভিত্তিক ছোটকাগজ হলো—আমাদের পাখি (২০১৯), রঙধনু (২০০৫), ফোঁটা (২০১৮), দেশের কথা (২০০৪), বাতিঘর (২০১৫), বিন্দু (২০০৯), উৎস্বর্গ (২০১৬), কংস (১৯৯০) ইত্যাদি নানা সংগঠনের সাহিত্যচর্চার চাতাল।

স্থানিকের কাজগুলো এক মলাটে আনার ধারণা থেকেই মূলত ১৯৭০ সাল খেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রকাশিত ছোটকাগজের হদিশ দিয়েছি মাত্র। বাছাইয়ের কোনো বাটখারা বা নিক্তি রাখা হয়নি। প্রাপ্ত সকল ছোটকাগজের তথ্য-উপাত্ত দেবার পাশাপাশি নিজের কিছু কথাবার্তা ভরে দিয়েছি—সংযোগের মশলা হিসেবে, এর চেয়ে বেশি কিছু করি নাই।

তবে হ্যাঁ, যে সকল কবিতা উদ্ধৃতি দিয়েছি—সেগুলো আমার ব্যক্তিগত পছন্দের বাছাই, সমগ্রদেশের প্রেক্ষিতে কোনো তুলনা আমার লক্ষ ছিল না—স্রেফ স্থানিকের মনভূমির কর্ষিত জমিনকে দেখা ও দেখানোর পায়তারা; আর কী করে মনোভূমি দৈর্ঘ্যপ্রস্থ গভীরে বাড়ানো যেতে পারে ভেতরে ভেতরে গোপন এক টান সদা হাজির থেকেছে—সেটি হোক শেরপুর কিংবা নাচোল অথবা কাউখালী—টাউন শেরপুরের স্থানিকতা উপলক্ষ মাত্র।

এক

১৯৭০ সাল। বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে আর্বিভাব হবার প্রসূতি সময়। সাহিত্য-সংস্কৃতি রাজনৈতিকতার নানা তৎপরতার ভেতর দিয়ে চলছে আত্মপরিচয় সন্ধানের লড়াই সংগ্রাম। কী কবিতা—কী গানে—কী সাহিত্য পত্রিকা চর্চায়—জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলার জল, বাংলার ফল, বাংলার মাটির সাথে নিজেকে মিলবার ও মেলাবার জাতীয়তাবাদী দশক।

এমন সময়ে ‘পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন’ শেরপুর মহাবিদ্যালয় শাখা প্রকাশ করেন ‘আবাহন’। নববর্ষ সংখ্যা। নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ ও আবদুছ ছাত্তারের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটির মূল্য পঁচিশ পয়সা। ‘আমাদের প্রেস’ জামালপুর থেকে মূদ্রণ। নববর্ষের আহ্বান জানিয়ে ‘আবাহনে’ শাহেদা বেগম রুনু লিখেছেন—

‘মাধবীলতার কানে কানে,

চুপি চুপি—

বাতাস বলে গেল,

—সে আসবে...

গাছের ডালে বসে

সুন্দর পাখিটা ভাবলো

—সে আসবে...’

(চৈত্রের শেষে)

গোলাম রহমান রতন লিখেছেন, 'কোনো আঞ্চলিক ভাষাভাষী লোকের পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে, সেই অঞ্চলের সংস্কৃতি।... সংস্কৃতির নিজস্ব স্বকীয়তা যেমন বিদ্যমান প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে, তেমনি তার প্রকাশও বিভিন্ন একই কারণে। তাই মোমেনশাহী গ্রাম্য অঞ্চলের বিয়ের গানের সাথে পাঞ্জাবী বিয়ের গানের সামঞ্জস্যতা বিরল।'[১]

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' গোলাম রহমান রতন আরো লিখেছেন, 'লোকসমাজই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক; সে কারণে লোক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্বভাবতই সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজ জীবনের সম্পর্ক ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। আর সমাজ জীবনের ভিত্তিটাই দাঁড়িয়ে আছে সম্পদ সম্ভার ও তার ব্যবহার প্রনালীর উপর; জীবিকার নতুন উপাদান ও উপকরণের আবিষ্কারে অগ্রসর হচ্ছে জীবন যাত্রা।'[১]

'আবাহনে' আরো লিখেছেন বিজন কর্মকার, মতীশ চন্দ্র কর, তপন সেন উদয় শংকর রতন, সাধন গুপ্ত প্রমুখ।

'স্নিগ্ধ সলিলে উত্তাল তরঙ্গ দমকা হাওয়ার আভাস

মহাবীর, নহ ক্ষান্ত অতি দূরন্ত নব যুগের রাঙা প্রভাত

অশান্ত খড়গে দাম্ভিকের খর্বে শিলাবারি হানি

তান্ডব শেষে সুর আসে ভেসে মুকুলের কান্নাবাণী'

(উন্মাদ বৈশাখ : সাধন গুপ্ত)

শহর শেরপুর ছাত্র ইউনিয়ন থেকে একই বছরে প্রকাশিত একুশে সংকলন 'লাল পলাশ' (১৯৭০)-এর সম্পাদক বিপ্লব কুমার দে ওরফে দুলাল। দুলাল শেরপুরে কবিতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী।

পচাত্তুরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর কাদের সিদ্দিকীর ডাকে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠিত হয়—সেখানে তিনি জড়িয়ে পড়েন। এই প্রতিরোধ যোদ্ধা জামালপুরে তৎকালীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে নিহত হন।

তিনি একাধারে কবিতা-গল্প-নাটক রচনা করেছেন, অন্যদিকে সংগঠন চর্চায় শেরপুরে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। 'লাল পলাশ' তার প্রথম সম্পাদিত কাগজ।

'অন্ধকারের বুকচিরে একটি হৃদয়

শাশ্বত প্রেমের অভিসারে

এগিয়ে চলে...

এগিয়ে চলে নিষ্ঠুর সমাজের টুঁটি চেপে

আর মিথ্যা নিয়মের বাঁধ ভেঙে।'

(অন্ধকারের বুক চিরে : বিপ্লব কুমার দে দুলাল)

স্বাধীনতাপূর্ব ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র রাজনীতির চাতাল নির্মাণে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাকে হাতিয়ার করেছেন। হোক সে ছাত্র ইউনিয়ন কিংবা ছাত্রলীগ। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকেই শেরপুরে ছাত্র ইউনিয়নের বিস্তার ঘটে মূলত এই অঞ্চলে কমিউনিস্ট নেতাদের প্রযত্নে। বিপ্লবী রবী নিয়োগীর বৈপ্লবিকতা দাহিকা শক্তি হিসেবে তরুণদের মাঝে নতুন সমাজ বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে।

একইভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য টাউন ছাত্রলীগ ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে এডভোকেট আব্দুস সামাদ, আনিছুর রহমান, নিজাম উদ্দিন আহম্মদের মতো নেতৃত্ব তরুণদের উৎসাহিত করেছে।

১৯৭০ সালে অন্য ছাত্র সংগঠনের মতো ছাত্রলীগও অমর একুশে স্মরণে প্রকাশ করেন 'সূর্য অন্বেষা'। নব কুমার সাহা ও সফিকুর রহমানের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মরণিকার মূল্য পঞ্চাশ পয়সা। নিউ প্রেস শেরপুর টাউন থেকে মুদ্রণ 'পূর্ব্ব-পাক ছাত্রলীগ শেরপুর ও শহর শাখার প্রচার সম্পাদক তালাপতুর হোসেন মঞ্জু ও এমাদুল হক নিলু কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।'

লেটার প্রেসে ছাপা 'সূর্য অন্বেষা' হচ্ছে ছাত্রলীগের দ্বিতীয় প্রকাশনা। কবিতা লিখেছেন—রেজাউল করিম, সংগ্রাম চক্রবর্তী, বিকাশ দাশ, হাছান আলী। সুশীল মালাকারের নিবন্ধ 'বাংলা ভাষা ও উন্নাসিকতা'; নিত্যলাল বণিক লিখেছেন, 'সংগ্রামী মিছিলে দীপ্ত পতাকা অমর একুশে' অনুপ্রেরণামূলক প্রবন্ধ।

দুই

সময় ১৯৭১। বাংলা ও বাঙালির এক অগ্নিগর্ভ কাল। একুশে সংকলন 'রক্তের স্বাক্ষর'। রেজাউল ইসলামের প্রযত্নে শেরপুর মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদের স্মরণিকা।

কাঠ খোদায়ের প্রচ্ছদ করেছেন হাবিবুর রহমান। স্থানিক পর্যায়ে কাঠ খোদাই কাজ এটিই প্রথম। পরবর্তী সময়ে বিজন কর্মকার চমৎকার কাঠ খোদাই প্রচ্ছদ বিভিন্ন স্মরণিকায় প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯৭১ সালে 'রক্তের স্বাক্ষর' ছাড়া অন্য কোনো ছোটকাগজ শেরপুরে প্রকাশিত হয়নি। এই সাল বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনে জীবনবাজির রক্তবর্ষ। ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ ঠিক নামেই সংকলিত করেছেন 'রক্তের স্বাক্ষর'। রক্তের স্বাক্ষরেই আমাদের এই বাংলাদেশ।

এই সংকলনে প্রবন্ধ লিখেছেন—নিত্যলাল বনিক, সংগ্রাম চক্রবর্তী। গল্পে—আখতারুজ্জামান, সুভাষ চন্দ্র ও রেজাউল ইসলাম। কবিতা লিখেছেন—জায়েদা খাতুন, আহসান হাবীব শ্যামল আর দুলাল দে বিপ্লব।

'কাল বৈশাখীর ঝড় দেখছ! কাল বৈশাখীর ঝড়?

বাতাসে উড়েছিল গো কত জীবনের স্বর।

ঘর আমার, তবুও আমরা নইকো ঘরের স্বামী

কতকাল আর দেখবো বল ওদের ষন্ডামী।

(একুশের ছড়া : উদয় শংকর রতন)

১৯৭২ সালে শেরপুর মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় ‘ওরা মরনজয়ী’। শফিকুর রহমানের সম্পাদনায়। স্বাধীনতার পর এটিই প্রথম স্মরণিকা। সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান লিখেছেন—

ও আমারও ভাই ছিল

আমি বেঁচেই আছি

স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে

শৃংখল মুক্ত বীর জনতার মাঝে।

(ভাই বুলবুল)

পরবর্তী বছর একুশে সংকলন ‘ওরা মরণজয়ী’ বের হয় আহসান হাবীব শ্যামলের স্পাদনায়। লিখেছেন—সংগ্রাম চক্রবর্তী, সুভাষ চন্দ্র বাদল, তালাপতুফ হোসেন মঞ্জু, শাহানা পারভীন মিনা ও আবদুস সোবহান।

‘স্পন্দিত শোনিত’ (১৯৭৩) একুশের সংকলন। ভাষার মাস ও স্মরণিকা প্রকাশের চর্চা নিয়ে চমৎকার নিবন্ধ লিখেছেন অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল হান্নান। এই সংসদের ভি পি মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ লিখেছেন, ‘মুক্তির অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ করে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠন করতে হবে।’

এই সংখ্যায় আরো লিখেছেন—দিপ্তি কনা সাহা, রাবিউল রহমান, আক্তারুজ্জামান, নিত্যলাল বনিক প্রমুখ। সম্পাদক সংগ্রাম চক্রবর্তী লিখেছেন, ‘মহান ভাষা আন্দোলন ও আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি’ বিষয়ক চমৎকার প্রবন্ধ। তিনি স্বাধীনতার পূর্বাপর শেরপুরে কবিতা ও প্রবন্ধে নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছেন।

‘অগ্রনী’ (১৯৭৩) সম্পাদক তপন সেন। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। মেধাবী ছাত্র। ইউনিয়নের ঘরনায় তপনের নিজস্ব কাগজ। এক ফর্মার কাগজ। নিউজ প্রিন্টে ছাপা; সালমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, নিউ মার্কেট শেরপুর থেকে।

সম্পাদক লিখেছেন, ‘আমাদের চেতনার দৃঢ়তায় যে সন্মিলন মুক্তির, সমাজতন্ত্রের এবং দেশকে গড়ে তোলার—সেই মহতী আদর্শকে বাস্তবায়নের বজ্র শপথ নিয়ে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ এবং দেশবাসীকে ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছি।’

নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অগ্রণীতে লিখেছেন—আব্দুর রশিদ খান, খন্দকার আবুল কাশেম, নূরল ইসলাম হিরু, সুফিয়া খাতুন ও দুলাল দে বিপ্লব।

‘আমার সবুজ আত্মা ভাগ হয়ে যায়

মানচিত্রে অনেক রক্ত

ছোপ ছোপ

মাতৃ হত্যার নিষ্ঠুর মহড়ায়’

(আমার সবুজ আত্মা : তপন সেন)

তিন

১৯৭০ সালের প্রথম দিকে তরুণ কবিদের নিয়ে গঠিত হয় ‘কণ্ঠস্বর সাহিত্য পরিষদ’। বামধারার সাহিত্য কর্মীদের নিয়ে গোলাম রহমান রতনের নেতৃত্বে গঠিত হয় এই সাহিত্য পরিষদ। এই পরিষদের মুখপত্র ‘অঞ্জন’ প্রকাশিত হয় ডিসেম্বরে গোলাম রহমান রতন ও উদয় শংকরের যৌথ সম্পাদনায়। প্রচ্ছদ করেন কবি রণজিত নিয়োগী। বিনিময় মূল্য পঁচিশ পয়সা।

গত শতকের সাতের দশকে শেরপুরে সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন, ‘...যখন আচমকা বাতাস এসে সমুদ্রের বেলাভুমিতে আছড়ে পড়েছে—তখন ছিটাফোঁটা সমুদ্রের লোনা জল এসে ক্ষণিকের জন্য বেলাভূমিকে দিয়েছে প্লাবিত করে, কিন্তু সমুদ্র যখন নিস্তরঙ্গ তখন আর বেলাভুমিতে স্নাত করতে পারিনি।—শুকিয়ে গেছে—ঠিক তেমনি আমাদের স্থানীয় সাহিত্য অঞ্জান।’[১]

‘কিশোর কবি সুকান্ত স্মরণে’ গোলাম রহমান রতন লিখেছেন চমৎকার আখ্যান; তেমনি উদয় শংকর রতনের গল্পটি সুখপাঠ্য। ‘রবীন্দ্র কাব্যে নারী’ নিবন্ধ লিখেছেন দুলাল চন্দ্র দে। এই তিনজনই শেরপুরে সাহিত্যচর্চায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

পত্রিকা প্রকাশ কিংবা সংগঠনচর্চা— উদ্যোমী এই তিন জন গত শতাব্দীর সাতের দশকে প্রাগ্রসর তরুণ। পরবর্তী সময়ে কোনো লেখক তাদের সাহিত্য কর্ম নিয়ে পর্যালোচনায় এগিয়ে আসেননি। স্থানিক সাহিত্য চর্চার চাতাল নির্মাণে তাদের ভূমিকা অসধারণ। ‘অঞ্জন’ একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময় পত্রিকা। মাত্র দুটো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। একটি স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয় স্বাধীনতার পরে। পরের সংখ্যার সহ-সম্পাদক ছিলেন দুলাল দে বিপ্লব।

এ ছাড়া এই পরিষদ থেকে ‘ঘোষণায় আমরা’ এবং ‘নন্দিত নবীন’ নামে দুটি সাহিত্য পত্রিকা অনিয়মিত সংখ্যা হিসেবে বের হয়। তবে ‘অঞ্জন’ যেভাবে সজ্জিত হয়ে ওঠেছিল, সেভাবে ‘ঘোষণায় আমরা’ ও ‘নন্দিত নবীন’ সাজতে পারেনি। আর ‘অঞ্জন’ও বিকশিত হতে পারেনি।

সংখ্যাগুলোতে আরো লিখছেন—জিতেন সেন নুরুল ইসলাম হিরু, মোজাম্মেল হক, প্রণব দে, মুশতাক হাবিব শাহেদা বেগদ ও শিবানী দে।

‘পিকাসোর ছবির মতন

একটা ষাঁড় একটা ঘোড়া

মুখোমুখি উদ্যত;

এ ওকে ধরছে

ও একে ধরছে

ঘোড়াটা বাঁচাতে চেয়ে

মুখোমুখি ময়ুর পাশে দাঁড়িয়ে।
আর্তচিৎকার
আর্তচিৎকার
মেয়েদের মায়েদের শিশুদের
শুধু চিৎকার।
ষাঁড়টা ফুঁসছে ক্রুদ্ধ গর্জনে।
নীরবতার মধ্যবিত্ততাকে সাক্ষী রেখে
একটা কান্ড ঘটে গেল।'
(স্কেচ : গোলাম রহমান রতন)

১৯৭৪ সালে 'কণ্ঠস্বর সাহিত্য পরিষদ'-এর সর্বশেষ অনিয়মিত সংখ্যা 'ঘোষণায় আমরা' প্রকাশিত হয়। এটি ছিল চতুর্থ সংখ্যা।

চার

গত শতাব্দীর ছয়ের দশক বাঙালি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ে পরিচিত হবার দশক। স্বাধীকার অর্জনে ব্যক্তি ও সমাজের আলোড়িত হবার দশক। ষাটের তরুণ জাতীয়তাবাদী বা মার্ক্সবাদী হওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো পথ ছিল না। সময়ের আহ্বান—সময়ের বাধ্যবাধকতা তরুণকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে। শেরপুরের যুব সমাজ তার ব্যতিক্রম নয়।

গোলাম রহমান রতন লিখেছেন, 'প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চর্চা বজায় রাখতে গিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও করেছি। ষাটের দশকে শেরপুরে সংস্কৃতি চর্চা বলে কিছু ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। সংস্কৃতিতে ছিল পুরো বন্ধ্যাত্ব।'[১]

এমনিতেই দেশভাগজনিত প্রতিক্রিয়ায় দেশজুড়ে ছিল অস্থিরতা, অন্যদিকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর নিজস্বতা অর্জনের জন্য ছিল নানা রাজনৈতিক তৎপরতা।

ষাটের দশকে শেরপুরে ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল' নামে সরকারি পর্যায়ের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। মুহম্মদ আখতারুজ্জামান 'হৃদয়ে হীরা কাকা' স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাকিস্তানি সংস্কৃতি তথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌলবাদভিত্তিক এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি তুলে ধরা হতো।'[২]

ষাটের তরুণ ইমদাদুল হক হীরা (১৯৩৪-২০০৭) বাঙালি সংস্কৃতির ধারাকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে গড়ে তোলেন 'গণসংস্কৃতি সংসদ'। মূলত আর্ট কাউন্সিলের নানা তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী তরুণেরা ইমদাদুল হক হীরার নেতৃত্বে গঠন করলেন 'গণসংস্কৃতি সংসদ।

আক্তারুজ্জামান লিখেছেন, 'হীরা কাকার বাসায় প্রথম যে মিটিং হয়, সেখানেই জন্ম হয় এই গণসংস্কৃতি সংসদ',[২] সময় ১৯৬৮ সাল।

উপস্থিত ছিলেন—শাহেদা বেগম রুনু, সৈয়দ আব্দুল হান্নান, আবুল কাশেম আব্দুর রশিদ, লুৎফর রহমান মোহন, গোলাম রহমান রতন, আমজাদ হোসেন, মুহসীন আলী, সুরঞ্জিত সাহা, নিতাই হোড় নারায়ন হোড়, রণজিত হোড়, তপতী হোড়, জয়শ্রী নাগ, সাহিদা বেগম, পরিতোষ পাল, বিজন কর্মকার, সুষেণ মিত্র মজুমদার, তৃপ্তি দে, চিত্রা মিত্র মুক্তি, আলো চায়না, চম্পা প্রমুখ।[২]

গণসংস্কৃতি সংসদের কোনো মুখপত্র ছিল না। সংসদের হাতিয়ার ছিল নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য। শেরপুরে সাংস্কৃতিক চর্চার জমিন বিনির্মাণে সংসদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। সংসদের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আবদুল হান্নান ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এমাদদুল হক হীরা।

'সর্বতোভাবে প্রগতিশীল ও গণমুখী সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাই ছিল গণসংস্কৃতি সংসদের উদ্দেশ ও লক্ষ্য'[২] লিখেছেন শেখ আবদুল জলিল। উনসত্তরে উত্তাল বাংলাদেশ। জলিল বলেন, 'উত্তাল জনগণের মন ও জীবন প্রতিবাদমুখর। সে সময়ে যা কিছু পাকিস্তানি তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিল গণসংস্কৃতি সংসদ।'[২]

শেরপুরে নাটক চর্চার ইতিহাস বহু পুরনো। নয়ানী জমিদারদের নাট্যপ্রীতি সকলেই জানেন। কেউ একজন হয়তো সেই ইতিহাসের তত্ত্বতালাশ করবেন। তবে এখানে বলে রাখি, এই সংসদ থেকেই প্রথম শেরপুরে ছেলে-মেয়েরা একসাথে নাটকে অভিনয় করা শুরু করেন।[২] সংসদ ছিল নাটক প্রধান সংগঠন।

ছেলে-মেয়েদের যৌথ অভিনয়নের মাধ্যমে 'প্রবেশ নিষেধ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এ ছাড়া ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রূপালী চাঁদ', আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', 'সংবাদ কার্টুন', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'সংবাদ শেষাংশ'[২] নাটক মঞ্চস্থ হয়।

মূলত মার্ক্সবাদী তরুণেরাই গড়ে তুলে গণসংস্কৃতি সংসদ। সেই আলোকেই সংসদ পরিচালিত হচ্ছিল। প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর জাতীয়তাবাদী তরুণেরা সংসদ থেকে বের হয়ে গড়ে তুলে 'কৃষ্টি প্রবাহ' গোষ্ঠী। বঙ্গাব্দ ১৩৭৭ (১৯৭০) সালে কৃষ্টি প্রবাহের যাত্রা শুরু।

মুহাম্মদ আক্তারুজ্জামান বলেন, 'আদর্শিকতার কারণেই কৃষ্টি প্রবাহের জন্ম। ডা. আহমেদুর রহমানের বাসায় গণসংস্কৃতি সংসদের সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন থেকে গণসংস্কৃতি সংসদ ভেঙে কৃষ্টি প্রবাহ সৃষ্টি হয়।'[২] মুহম্মদ মুহসীন আলী সভপতি ও নারায়ণ চন্দ্র হোড়কে সাধারণ সম্পাদক করে প্রবাহের যাত্রা শুরু হয়।

যদিও ছিয়াত্তর সালে কিছু তরুণ 'কৃষ্টি প্রবাহ' থেকে বের হয় গঠন করলেন 'ত্রিসপ্তক', দীলিপ পোদ্দারের নেতৃত্ব। আরো যুক্ত হলেন—অভিনেতা দেবদাস চন্দ, তবলাবাদক উদয় সাহা, নর্তক কমল পাল।

গোলাম রহমান রতন লিখেছেন, 'নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে কতিপয় তরুণের প্রচেষ্টায় 'ত্রিসপ্তক গোষ্ঠী' গঠিত হয়েছে। পপ সঙ্গীতের নতুন জগতে এদের প্রবণতা লক্ষণীয়।'[৯] তবে ওস্তাদ কানুসেন গুপ্ত

কৃষ্টি প্রবাহে প্রশিক্ষক হিসেবে থেকে গেলেন। পরবর্তী কালে এই তরুণেরা শেরপুরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে।

‘কৃষ্টি প্রবাহ’ একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। গান-নৃত্য-বাঁশি-তবলা শেখার প্রতিষ্ঠান। শেরপুরে নাট্যানুষ্ঠান, প্রীতি সন্মীলনী জয়ন্তী উৎসব ছাড়াও বিভিন্ন দিবসকেন্দ্রিক পত্রিকা প্রকাশ করেছে। এমনকি ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র নদ খননের স্বেচ্ছাশ্রম, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে কৃষ্টি প্রবাহ।

কৃষ্টি প্রবাহের অভিনীত নাটকগুলো হলো : মেঘে ঢাকা তারা, লবণাক্ত, সকালের জন্য, জীবন রঙ্গ, ফাঁস ও নিষ্কৃতি।[৯] সাতের দশকে কৃষ্টি প্রবাহ সাংস্কৃতিক চর্চায় টাউন শেরপুরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দেশভাগের কারণে অনেক সাংস্কৃতিক কর্মী দেশত্যাগের কারণে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে ভাঁটা পড়েছিল কৃষ্টি প্রবাহের নানামুখী কায়কারের টাউন শেরপুরে আবারো সাংস্কৃতিক চর্চার জোয়ার আসে। কৃষ্টি প্রবাহ একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষার প্লাটফর্ম। সেখানে নাচ-গান-অভিনয়-তবলা বাজানো থেকে শুরু করে বাঁশী শেখানোর কার্যক্রম ছিল।

১৯৭৪ সালে কৃষ্টি প্রবাহ প্রকাশ করে ‘শহীদ স্মরণিকা’ বুলেটিন। সম্পাদক সুশীল মালাকার। সম্পাদক লিখেছেন, ‘একটা জাতির ঐশ্বর্য প্রতিভাত হয় ভাষার মাধ্যমে। বাঙালি জাতির প্রধান সম্পদ হচ্ছে তার মুখের ভাষা; প্রাণের ভাষা—বাংলা ভাষা। এই ভাষাতেই সে ঐশ্বর্যবান। কিন্তু সেই ঐশ্বর্যবানের সংখ্যা কত?’

সম্পাদক সুশীলের একটি মৌলিক প্রশ্ন যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ১৯৫২ থেকে ২০২১। অনেক বছর পেরিয়ে এসেছি আমরা। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যে অবগাহন করতে পারিনি। পারিনি ভাষা মুক্কির চেতনায় ঋদ্ধ হতে। প্রভাত ফেরিতে যাচ্ছি, কালো ব্যাজ ধারণ করছি। পারিনি বুঝতে যে ভাষামুক্তি কথাটা শুধুমাত্র বাংলা ভাষা প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল ভাষার জন্য সমান সত্য।

যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ একদিন নিপীড়নের শিকার—সেই ভাষাভাষী মানুষেরা আজ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার উপর আধিপত্য জারি রেখেছি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা এখন সংকটাপন্ন। এটা একুশের চেতনা নয়। হারিয়ে যাচ্ছে বহু ভাষা।

বহুভাষা সংস্পর্শে জীবন পায় বহুরৈখিকতার স্বাদ। একুশের চেতনা সকল ভাষার বিকাশের চেতনা। একুশের চেতনা সকল ধরনের আধিপত্য বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি।

কৃষ্টি প্রবাহের মুখপত্র ‘প্রবাহ’ অনিয়মিত দিবসভিত্তিক পত্রিকা। ১৯৭৪ সালের শহীদ সংখ্যা বুলেটিনে সুনীল বরন দে’ তার ‘শেরপুরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার’ নিবন্ধে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানি অটোক্রেসির বিরুদ্ধে যুগের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যখন আত্মস্বাতন্ত্র্য চেতনায় রূপ নিলো—তখনই বাংলা সংস্কৃকিতে বিপ্লবের সূচনা হলো।’

‘অনেক অন্ধকারকে বুকে তুলে নিয়ে

সূর্যের আলোকে

তোমাকে অনেক খুজেছি

ব্যর্থতার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে

জীবনে কি পাইনি—কি পেয়েছি?’

(মুক্তির আলোকে তোমাকে/ উদয় শংকর রতন)

সম্পাদক সুশীল ‘প্রবাহ’ ছাড়াও স্বাধনীতার পূর্বে ‘দখিনা’ নামে আরেকটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সুশীল মালাকার লিখেছেন, ‘১৯৬৭ সালে আমি ও মোজামেল হকের যৌথতায় ‘দখিনা’ নামে নিউ প্রেস থেকে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে পত্রিকাটির একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরই বন্ধ হয়ে যায়।’[৩]

সুশীল মালাকার রাজনৈতিক কারণটি কী তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। করলে হয়তো বোঝ যেত মফস্বলে সাহিত্য পত্রিকা করার প্রতিবন্ধকতার মাত্রার ধরন-ধারণ। ‘দখিনা’ ছাড়া সুশীল কিশোর বয়সে আরো একটা পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন, ‘১৯৫৭-৫৮ সালে আমি ও অধীর চন্দ্র দাসের সম্পাদনায় ও আবুল কাশেমের সহযোগিতায় ‘কিশোর’ নামে হাতে লেখা একটি পাক্ষিক পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল।’[৩]

পাঁচ

১৯৪৭ সালের পূর্বের পঞ্চাশ বছর শেরপুরে কোনো সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে কি-না তার কোনো দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদিও টাউন শেরপুরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিকচর্চা বিশেষ করে নাট্যচর্চার ধারাবাহিক কার্যক্রম ছিল।

পন্ডিত ফসিহুর রহমান ও অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন শেরপুরের ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও তাদের বইতে সাহিত্যপত্রিকা বিষয়ক কোনো আলোচনা করেননি।

উনিশ শতক থেকেই শেরপুরে সাহিত্যচর্চার জমিন তৈরি হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে হরচন্দ্র চৌধুরীই (১৮৩৭—১৯১০) এ-জেলায় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রথম পথিক।[৪]

তিনি ছাড়াও পন্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার (১৮৩৬—১৯১০), বিজয়কৃষ্ণ নাগ, রাধাবল্লভ চৌধুরী, রামকান্ত, রামনাথ বিদ্যাভূষণ, হরগোবিন্দ লস্কর, হরসুন্দর তর্করত্ন, নারী কবি হিরন্ময়ী চৌধুরী, পাইকুড়া গ্রামের অধিবাসী পুঁথিলেখক রমজান আলী, কবি ফজলুল রহমান আজনবী, আব্দুল কাদের মুন্সী, একই গ্রামের বিপ্লবী ও লেখক প্রমথ গুপ্ত, কবি কিশোরী মোহন চৌধিরী, মীরগঞ্জ অধিবাসী মুন্সী বছির উদ্দিন, শ্রীবর্দীর গোলাম মোহম্মদ এবং রৌহা গ্রামের

অধিবাসী সৈয়দ আবদুস সুলতান[৪] শেরপুরের সাহিত্যচর্চার স্মরণীয় বরণীয় অগ্রসৈনিক।

তাঁদের সাহিত্যকৃত্য নিয়ে দুই ইতিহাস লেখক বিশেষ কিছু লিখেননি। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনালোকিতই থেকে গেছে। এতে করে শেরপুরকে জানবার-বুঝবার ও ছড়িয়ে দেবার পথ হয়ে গেছে সংকীর্ণ।

‘ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি উপজাতি অধ্যুষিত জনপদে বিদ্যোৎসাহী কতিপয় জমিদারদের প্রচেষ্টায় যে বিকাশ শুরু হয়েছিল—দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক যুগে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি।’[৪]

দেশভাগ উত্তর দশ বছরে শেরপুরের কি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি? একদিকে, দেশভাগজনিত মানুষের অস্থিরতা, কেউ কেউ পাড়ি দিচ্ছে সীমান্তের ওপারে, পরিবার ভাঙছে—অন্যদিকে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আবির্ভাব—এই সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ কি সেই সময়ের তরুণদের প্রভাবিত করেনি?

তা ছাড়া বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের বছর? ১৯৫২ সালে ভাষার প্রশ্নে লড়াই সংগ্রাম শেরপুরে রাজনৈতিক কার্যক্রম ছিল বলিষ্ঠ। সেই সময়ে কি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি? অনেক অনুসন্ধানে তথ্য পেলাম ‘সাপ্তাহিক পয়গাম’[৪] সৈয়দ আবদুস সুলতান ১৯৫২ সালে প্রকাশ করেন।

সৈয়দ সুলতান স্বাধীনতার পর ব্রিটেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এ ছাড়া দেশভাগ উত্তর সময়ে আর কোনো সাহিত্য পত্রিকা হয়নি। কেন হয়নি তার কার্যকারণ কেউ হয়তো খুঁজবেন।

তবে এখানে একটু তথ্য যোগ করা যেতে পারে। দেশভাগের তিন বছর পর টংকপ্রথাবিরোধী যে আন্দোলন ময়মনসিংহের উত্তরে শুরু হয়েছিল, সেই আন্দোলনে শহীদ হন নারিতাবাড়ি কমিউনিস্ট নেতা কমরেড শচী রায়, ১৯৫০ সালের ১৬ মে। তিনি দেশভাগ উত্তর প্রথম শহীদ।

তাঁর স্মরণে কমিউনিস্ট পার্টি একটি বুলেটিন প্রকাশ করে। নাম ছিল ‘রশ্মি’।[৫] শহীদ স্মরণে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা রস্মিতে ছিল রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও শচী রায়কে উৎসর্গ করে লেখা কবিতা।

১৮৬৯ সালের ১৬ জুন শেরপুর পৌরসভা ঘোষিত হবার চার বছর পূর্বে ‘বিদ্যোন্নতি সাধিনী’ (১৮৬৫)৬ নামে একটি মাসিক পত্রিকা যাত্রা শুরু করে জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরির প্রযত্নে চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারে সম্পাদনায়।[৭]

উক্ত পত্রিকা প্রকাশের আগে গঠিত হয় ‘বিদ্যোন্নতি সাহিত্য চক্র’।[৭] গোপা হেমাঙ্গী রায় তাঁর ‘সোনার খাঁচার দিনগুলি’ বইতে লিখেছেন, ‘ঘনিষ্ঠ বন্ধু চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার ও ঈশান চন্দ্র বিশ্বাসের উৎসাহে ও প্রেরণায় ১৮৬৫ সালে হরচন্দ্র নিজের বাড়িতে ‘বিদ্যোন্নতি সভা’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন।’[৭]

তখন শেরপুর তো দূরের কথা ময়মনসিংহে কোনো প্রেস ছিল না। ছিল না কাছাকাছি ধনবাড়ি কিংবা টাংগাইল জমিদার শাসিত কোনো অঞ্চলে। ‘বিদ্যোন্নতি সাধিনী’ ময়মনসিংহ জেলার প্রথম পত্রিকা।[৬]

এই সভা থেকেই প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক চারুবার্তা। তখনো পৌরসভা গঠিত হয়নি। যে বছর শেরপুরে পৌর সভা হয়, সেই একই বছরে আট এপ্রিলে ময়মনসিংহ পৌরসভা গঠিত হয়। শেরপুর পৌরসভা ময়মনসিংহেরর চেয়ে কয়েক মাসের ছোট এবং প্রান্তিক পৌরসভা। নিশ্চয় সেই সময়ে শেরপুর অঞ্চল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিকভাবে পরিগঠিত হবার সূচক ব্রিটিশের বার্ষিক রিপোর্টে উর্ধ্বমুখী ছিল।

১৮৮০ সালে ‘চারুপ্রেস’[৯] প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রেস থেকেই গিরিশ সেন কৃত পবিত্র কোরআন শরিফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। ‘১৮৮১ সালের শেষ ভাগে আমি ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করি, সেখানে কোরাণ শরিফের কিয়দ্দূর অনুবাদ করিয়া প্রতিমাসে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই। শেরপুরস্থ চারুযন্ত্রে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়...’[৮]

একই প্রেস থেকে ১৮৮৫ সালে মীর মশাররফ হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’ ছাপা হয়। অন্যদিকে, শেরপুরে জমিদারদের মাঝে শরিকী ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব যেমন ছিল, তেমনি ছিল কল্যাণমূলক কাজের প্রতিযোগিতা (ভিক্টোরিয়া স্কুল ও জিকে পাইলট স্কুল প্রতিষ্ঠা উল্লেখ্য)।

নয়আনী জমিদারের পাশাপাশি পৌনে তিন আনী জমিদার প্রতিষ্ঠা করেন জগন্নাথ অগ্নিহোত্রির প্রযত্নে ‘শেরপুর বিজ্ঞাপনী প্রেস’ (১৮৯৫)। এই প্রেস থেকেই প্রকাশিত হয় ‘সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী সংবাদ’।

শেরপুরের জমিদারবৃন্দ শুধুমাত্র বাণিজ্যের জন্যই শুধু প্রেস স্থাপন করেননি, তাদের ছিল সমাজ সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কল্যাণমুলক কার্যক্রম চালানো ও তার পরিসর নির্মাণ করা।

এই প্রান্তিকে যে প্রেস ব্যবসা সুবিধে করতে পারবে না তার সম্যক জ্ঞান জমিদার কর্তা ব্যক্তিদের ভালোই ছিল। জমিদার বিলাসী হলেও, পাকা চুলের নায়েবদের লাভ-ক্ষতির হিসাব ছিল নখের ডগায়।

নয়আনী জমিদারের অধীনে ব্যবস্থাপকের চাকরি করতে আসা গীতিকবি গোবিন্দ দাসের কয়েক কাব্যগ্রন্থ এই চারু প্রেস থেকেই নয়আনী জমিদারের পৃষ্টপোষকতাই প্রকাশিত হয়। নিয়মিত বিদ্যোন্নতি সাধিনী প্রকাশিতও হচ্ছে এই প্রেস থেকে। হরচন্দ্রের ‘সেরপুর বিবরণ’ গ্রন্থের অধিকাংশ রচনা এই কাগজেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

বছরভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণিত ‘সেরপুর বিবরণ’ গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত। শেরপুরের সুধীমহল ও পরবর্তী সময়ে যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন, তারাও সেরপুর বিবরণ (১৮৭৩) ও নাগবংশের ইতিবৃত্ত (১৯৩০) হতে প্রাপ্ত সাল-তারিখ লিখেই ইতিহাস রচনা সমাপ্ত করেছেন। কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেননি। তথ্য হিসেবে হাজির আছে শুধু।

তৎকালীন সময় ও তার কার্যকারণে কী ঘটেছে—কোন আর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই শেরপুর পল্লবিত হয়ে উঠল এবং কেনই-বা পরবর্তী পঞ্চাশ ষাট বছর নিষ্ফলা মাঠের মতো পড়ে রইল তার বিশ্লেষণ করা হয়নি।

শেরপুর পরিগঠনে হরচন্দ্র চৌধুরীর যে ভূমিকা তার কোনো মূল্যায়ন শেরপুরের ইতিহাস প্রণেতারা করেননি। নাগরিক সমাজও মনে রাখেননি এই বহুভাষায় দক্ষ পণ্ডিত মানুষকে। অধ্যাপক দেলওয়্যারের 'শেরপুরের ইতিকথা' (১৯৬৯), পণ্ডিত ফসিহুর রহমানের 'শেরপুর জেলার অতীত ও বর্তমান' (১৯৯০)—এই দু'টি বইয়েই পরবর্তী অনেক তথ্য-উপাত্ত তারা যুক্ত করেছেন।

এ-জন্য তারা আমাদের নমস্য। আগামী কালের কোনো ইতিহাসবেত্তা নিশ্চয় এই বইগুলো থেকে রসদ যেমন পাবেন, তেমনি পাবেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিকতার ঘটনা প্রবাহ ও তার কার্যকারণ এবং মিসিংলিংক।

একমাত্র নালিতাবাড়ির অধ্যাপক মোস্তফা কামাল হরচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর 'সেরপুর বিবরণ' সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, 'তাঁর বইটি শুধুমাত্র একটি তথ্য প্রদান ও গবেষণামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থই নয়—বিপ্লব, বিদ্রোহ অভ্যুত্থান ও জীবন চেতনা এবং বাস্তব সমাজ চেতনার এককালের সাক্ষী।

সবচেয়ে শিল্পী হরচন্দ্র চৌধুরীর প্রতি আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হয় এ জন্যই যে, সামন্ত জমিদার হরচন্দ্রেরা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষক সংগ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে—এই সামন্ত হরচন্দ্রই শেরপুরের কৃষক অভুত্থানের সংগ্রামী ও বৈপ্লবিক চেতনার জয় ঘোষণায় মুখরিত।

অন্তরের সমস্ত সত্তাটুকু নিঙড়িয়ে দিয়ে তিনি কৃষকদের সংগ্রামী চেতনাকে চিত্রিত করেছেন এবং আসল সত্য ও তথ্যের দিক নির্দেশ করেছেন। শিল্পী হরচন্দ্র চৌধুরী এখানে কৃষকদের সংগ্রামকে লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য একাত্ম। এখানে শিল্পী হরচন্দ্র চৌধুরী সামন্ত হরচন্দ্রকে পরাজিত করে স্বাধীন শৈল্পিক সত্তায় জাগ্রত ও স্পষ্টবাক।'[৪]

স্থানিক ইতিহাসের ভিত্তি যে প্রাতস্মরণীয় মানুষদের হাতে নির্মিত হয়েছে—তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েই এগুতে হবে সামনের পথ। আরো প্রয়োজন পর্যালোচনা। স্থানিক ইতিহাসের রসদ রচনা ছাড়া জাতীয় ইতিহাস বিকাশ হতে পারে না। একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী গঠনে স্থানিক ইতিহাস বিনির্মাণ ছাড়া হতে পারে না।

<u>ছয়</u>

কথা হচ্ছিল, 'প্রবাহ' নিয়ে। একটু ফ্ল্যাশ ব্যাকে দেখে নিলাম দেড়শত বছর আগের শেরপুরকে। ১৯৭৮ সালে নববর্ষ সংখ্যায় সুশীল লিখেন, 'মফস্বল শহর থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ করা যে কতটুকু কষ্টকর তা ভুক্তভোগীরা বেশ জানেন। এখানে ভালো প্রেস, ব্লক তৈরির সুবিধা নেই। সবসময় ভালো ছাপার কাগজও পাওয়া যায় না। তার মানে একটি একশো পৃষ্ঠার সংকলন নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করতে হলে অন্তত তিন মাস আগে থেকে তার প্রস্তুতি নিতে হয়।'

এটি ১৯৭৮ সালের বাস্তবতা। বর্তমানে কৃৎকৌশলের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। শহর টাউনে ছাপার কাজ খুব অল্প সময়ে করা যেতে পারে। তরুণদের সৃষ্টিশীল আড্ডা টাউন শেরপুরে খুব সন্তোষজনক নয়। ভার্চুয়াল বিশ্বলোকে তরুণদের অবাধ যাপন।

সংগঠন গড়ার প্রবণতা মাঝে মাঝে লক্ষণীয় হলেও, কর্ম তৎপরতা যতটুকু ফেসবুকে ততটুকু সাংগঠনিক তৎপরতায় নয়। গড়ছে আবার ক'দিন পর ঝিমিয়ে পড়ছে। সময়ের যাপনের দিশা, আমার বারবার মনে হচ্ছে, তারা খুঁজে পাচ্ছে না। সময়ের সুর ও স্বরকে সমন্বয় করতে পারছে না।

যদিও তথ্য বিপ্লবের গতিশীল সড়কে আমি-আমরা ছুটছি। দাঁড়াবার সময় নেই। যেন গতিই সব। স্থিতি সময়ের কুহক মাত্র। আর আগের মতো সংগঠিত হবার স্পেস নেই। জীবনযাপনে এনেছে গতির প্রাবাল্য। গ্লোবাল কানেকটিভিটির কারণে কেন্দ্র প্রান্ত ধারণাই পাল্টে যাচ্ছে।

সুশীল মালাকারদের প্রজন্মের সময় ও স্থানিকতা আর আজকের প্রজন্মের সময় ও স্থানিকতার ধারণা ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে। তবে আজকের তরুণ নিশ্চয়ই কালের ধ্বনি আয়ত্ত করে গড়বেন নতুন সময়ের সংগঠন। কঠিক করবে ন কালের দিশা।

প্রবাহে প্রকাশিত কবিতা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নয়া অনুভবের কবিতা।

ক.

'একদিন
মাটি ছুঁয়ে বলে ছিলে
এখানে বসত হবে।
মাটিতে কনুই রেখে
পরিপার্শ্বে আমি কোনো অবান্তর বাসনা খুঁজি না।
নতুন আঙ্গিকে খুঁজি শুদ্ধতম তোমার আঙুল
তোমার বুকের তাপে শঙ্খচূড় উষ্ণ ছায়াতাপ।
(বসত : রণজিত নিয়োগী)

খ.

'এই রকম সমর্পিত জীবন,
এই রকম নির্দিষ্ট সময়
লোক চক্ষুজনিত আপ্যায়ন
একজন পাখিরও আছে
একজন পাখিও

বুঝেছে ভালোবাসা আমার,
ক্ষুধার পরেও ঠোঁট ছুঁয়েছে গাঢ় গালে।’
(পুনরাবৃত্তি : শাহজাদী আঞ্জুমান আরা মুক্তি)

গ.
‘তোমার হৃদয়ে কি ছড়ানো নেই সবুজ বাতাস?
নক্ষত্রের নীল চোখে তুমি দেখো না-কি
নিটোল আকাশ?’
(সবুজ বাতাস : রেহানা পারভীন হাসি)

ঘ.
‘শৈশবে ঠাকুমা’র মুখে এমনি জ্যোৎস্না রাতে
শুনেছি তোমার দেশের গল্প।
মাঝে মাঝে দেখি চাঁদ তুমি মেঘের দেশে
লোকচুরি করে।
তখন আমার হৃদয়
এক অজানা ভয়ে কাঁপন জাগায়।
মনে হয় তুমি হারিয়ে গেলে।’
(মায়াবি : সাবিত্রী কারুয়া)

নববর্ষ সংখ্যাটি গোছালো একটি সাহিত্য পত্রিকা। লেখা নির্বাচনে সম্পাদকের মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। এ ছাড়া আরো লিখেছেন— মুহাম্মদ মুহসীন আলী, আবু আহম্মদ জাফর ইকবাল, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, প্রণিতা কর, কল্যাণী কর্মকার, খালেদা রায়হার রুবী, উদয় শংকর রতন ও মুহাম্মদ আবু তাহের।

গত শতকের আটের দশকের শেষ দিকে কৃষ্টি প্রবাহের কার্যক্রম খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলতে গিয়ে একেবারে থেমে যায়। সম্ভবত শেষ সংকলন (আমার হাতে প্রাপ্ত তথ্য হতে) প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালের একুশে সংকলন। সম্পাদক উদয় শংকর রতন। সভাপতি ছিলেন মো. আবদুর রশীদ।

সর্বশেষ সংখ্যায় লিখেছেন—গঙ্গেশ দে, রবি নিয়োগী, বৃতেন্দ্র মালাকার, রবিন পারভেজ, জীবন চৌধুরি ও মানিক নাগ।

সাত

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী শেরপুর জেলা সংসদের প্রকাশনা অনিয়মিত হলেও, যে কটি প্রকাশনা করেছেন সবগুলোতে তুলে ধরেছেন স্থানিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির পসরা—হোক সে কবিতা বা প্রবন্ধ বা স্মৃতি কথকতা।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর ২৯ তারিখে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় উদীচী। উদীচীর ১৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলা সংসদ প্রকাশ করে ‘বজ্রে বাজে বাঁশী’, ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবরে। এটি উদীচীর তৃতীয় প্রকাশনা। তবে প্রকাশনার নাম চিহ্ন বারবার পাল্টিয়েছে। কখনো ‘অঙ্গিকার’ কখনো ‘মৃৎ’।

উদীচীর আর্দশ ও লক্ষ উদ্ধৃত করে এ সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখেন কবি ও সম্পাদক রণজিত নিয়োগী ও উদয় শংকর রতন। আগ্রহী পাঠকের জন্য তুলে ধরছি। ‘জীবনকে সুন্দর ও সমাজকে প্রগতিমুখী করা শিল্পীর মৌলিক ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব।

যেহেতু শিল্পীগণ সমাজ বিচ্ছিন্ন কেউ নন, যেহেতু শিল্পী সমাজের সম্মিলিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে—সমাজ প্রগতির পথ রুদ্ধ করে রাখা যুগ প্রাচীন সামাজিক সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা ও অবশেষ সমূহ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব এবং এই ভাবে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের পথ সুগম করা এবং এর মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সুখী সুন্দর দেশ গড়ার কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব।’

উদীচীর ‘বজ্রে বাজে বাঁশী’ প্রকাশনায় কবিতা ছাড়াও ছিল নিম্নোক্ত বিষয়—

১. ‘আমার ছোড়দা : সত্যেন সেন’ জ্যোৎস্না নিয়োগী।

২. ‘শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস : সংশপ্তক’—সুধাময় দাস।

৩. ‘আর নয় যুদ্ধ’ মুহাম্মদ আবু তাহের।

৪. ‘একুশের ভূমিকা’—শেখ জিনাত আলী।

৫. ‘বাংলা উপন্যাস ও ভাষা আন্দোলন’—সুধাময় দাস

৬. ‘নানকার বিদ্রোহ’—রবি নিয়োগী।

স্থানিকতার প্রেক্ষিতে শেরপুরে ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার জায়গাটি একেবারে সংকীর্ণ নয়। কখনো বিচ্ছিন্নভাবে কখনো গোষ্ঠীবদ্ধতার ভেতরে চর্চা কম বেশি হচ্ছিল। কিন্তু বেগবান হয়নি।

‘একদা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি উপজাতি অধ্যুষিত জনপদে বিদ্যোৎসাহী কতিপয় জমিদারদের প্রচেষ্টায় সাহিত্য চর্চার যে বিকাশ শুরু হয়েছিল,’ অধ্যাপক মোস্তফা কামাল তার ‘সাহিত্যে শেরপুরের অবদান’ নিবন্ধে বলেন, ‘দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক যুগে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি।’[৪]

উদীচী একটি আর্দশভিত্তিক শ্রেণী সচেতন শিল্পী গোষ্ঠী। একটি শ্রেণী-বর্ণহীন মানব সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলছে। উদীচীর সাংস্কৃতিক তৎপরতা মূলত রাজনৈতিক তৎপরতার উল্টোপীঠ।

তাঁর গান কবিতা কিংবা নাটক যে মাধ্যমেই কাজ করুক না কেন উদীচীর লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ব্যক্তিমানুষের মানস গঠনে এই শিল্পী গোষ্ঠী সদা সক্রিয়। শিল্পের জন্য শিল্প নয় বরং জীবন জন্য শিল্পের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা।

উদীচীর কর্মতৎপরতার অনেকাংশজুড়ে রয়েছে নাটক। শ্রেণী সচেনতা তৈরিতে নাটক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শেরপুর

জেলা শাখা গঠিত হবার পর পরই উদীচী তাঁর নাটক নিয়ে হাজির হয়েছে বারবার। নাটক শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার।

উদীচীর নাটক পরিচালনায় নানা সময়ে বিভিন্ন জন এগিয়ে আসেন। আসেন শিব শংকর কারুয়া। গত চার দশক ধরে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন—কখনো অভিনয়ে, কখনো নির্দেশনায়। উদীচীর ব্যানারে তাঁর নির্দেশিত নাটক 'খেলা খেলা' ১৯৯১ সালে উদীচীর কেন্দ্রীয় সম্মেলনে ঢাকা শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়।

এ ছাড়া মমতাজ উদ্দীনের 'বর্ণচোর' (১৯৮৫), সালাম সাকলাইনের 'চোর' (১৯৯২), 'ফাংশান' (১৯৮৫), 'জনৈকের মহাপ্রয়াণ' (১৯৮৬), 'মরা' (১৯৮৬) ইত্যাদি নাটক তিনি সফল মঞ্চায়ন করেন।

নাটক একটি সমন্বিত শিল্প। চারু ও কারুর সংমিশ্রণ। স্থানিকে নাটকচর্চার স্পেস বিকশিত হয়নি। এরই মাঝে এখানকার নাট্যপ্রেমিদের কাজ করে যেতে হয়। কখনো নাটকচর্চা সহজ ছিল না। এ প্রজন্মের পরিচালক শিব শংকরদের এইগুলো মোকাবেলা করেই এগুতে হয়েছে। ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতাই তাদের প্ররোচিত করে নাট্য আন্দোলনে যুক্ত হতে।

শিব শংকর কারুয়া ব্যক্তিগত আলোচনায় তাঁর নাটকচর্চা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার এইরকম আরেকটা ভালো লাগার কাজ হচ্ছে অভিনয় করা। ফোর ফাইভে যখন পড়ি তখন থেকেই অভিনয় করি। বাড়িতে ছোটরা শাড়ি চাদর দিয়ে স্টেইজ পর্দা বানিয়ে মঞ্চে নেমে পড়তাম। দর্শক ছিল আমাদেরই সমবয়সীরা। বাড়ির দু'চারজন বড়রাও কখনো কখনো শরিক হতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়েও নাটক করেছি।'

স্কুল ফাইনাল দেবার পর যে অখণ্ড অবসর সেই সময় তিনি বাড়ির অনুজদের নিয়ে অভিনয় করেন 'কাজীর বিচার', 'ফলভোগী', 'রক্তমাখা স্বাধীনতা' শ্রেণিতে পাঠ্য নাটকে।

কথা হচ্ছিল উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী নিয়ে। ১৯৮৭ সালে সারোয়ার মুর্শেদ রতনের নাট্যরূপ দেয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' মঞ্চায়নের সময় গল্প উপযোগী স্লাইড শো প্রদর্শন করেন আলোকচিত্রী নীতিশ রায়।

এ ছাড়া চিত্রী নীতিশ রায় '১৯৯৪ সালে আবারো 'দুই বিঘা জমি' ও 'লিচু চোর কবিতা দুটো অবলম্বনে নাট্যায়নের মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফি সোসাইটির জাতীয় গ্যালারিতেও এই স্লাইড শো প্রদর্শন করেন।'

টাউন শেরপুরে নাট্যচর্চার পূর্বাপর ইতিবৃত্ত থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ে নাচ্যচর্চা খুব একটা বেগবান হয়নি। স্বাধীনতার প্রথম দশক ও পরবর্তী দশক জাতীয়তাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত। পাড়া-মহল্লায় বিভিন্ন সংগঠন—হোক সে ক্রীড়া নাট্য বা সাংস্কৃতিক বা সাহিত্য পরিষদ অথবা শিশু সংগঠনের—জন্ম ও নানামুখী তৎপরতা লক্ষণীয়।

শ্রীবর্দী ঝিনাইগাতি নালিতাবাড়ি নকলা-সহ টাউন শেরপুরে তখন বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সাংবার্ষিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে গেছে নয়ের দশক পর্যন্ত। এমন কী কোনো কোনো গ্রামে নাটক মঞ্চায়ন হচ্ছিল।

বিশেষ করে শীতকালীন সময়ে। শ্রীবর্দীর কুড়ুয়া ভায়াডাঙা, বিষ্ণুপুর জগৎপুর, নন্দীবাজার নালিতাবাড়ির আড়াই আনী বাজার, মরিচপুরান, তারাগঞ্জ বাজার ইত্যাদি। নালিতাবাড়িতে গত শতাব্দীর তিনের দশক থেকে সংগঠনভিত্তিক নাট্যচর্চা ছিল। ছিল স্থায়ী মঞ্চ। সেই মঞ্চ ছিল ঘূর্ণায়মান।

'গত শতকের তিনের দশকে শেষে নালিতাবাড়িতে গঠিত 'তারাগঞ্জ আর্য নাট্য সমাজ' প্রতিমাসে দু'টি করে নাটক মঞ্চস্থ করত। এ গোষ্ঠীর স্থায়ী মঞ্চ ছিল। এত বড় মঞ্চ এবং আনুষাঙ্গিক সুযোগ সুবিধা মুক্তাগাছা ও গৌরীপুর ছাড়া এ এলাকার আর কোথাও ছিল না।'৩৩

মোস্তাফা কামাল লিখেছেন, 'এদেরই ছিল ঘূর্ণামান মঞ্চ।... এই অখ্যাত বিজলী বাতিবিহীন জনপদেও দর্শনীর বিনিময়েই নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।'৩৩

টাউন শেরপুরে যেমন নয়ানী বাড়ির জমিদারদের নাট্যপ্রীতি সকলেই অবহিত, এ ছাড়া বয়ড়া শেরিপাড়া প্রভৃতি স্থানে নাটক মঞ্চায়ন হতো। মোহিনী মোহন বল সেই যুগে একজন দক্ষ নাট্য পরিচালক ছিলেন। ছিলেন বিমল কর্মকার জাকির হোসেন হয়ে সুজয় মালাকারদের শহীদ মোস্তফা থিয়েটার ও ১৯৯৬ সালে গঠিত সমকাল নাট্যাঙ্গন।। নয়ের দশকে এই দুটি থিয়েটার নাট্যচর্চা ও মঞ্চায়নে টাউন শেরপুরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নতুন শতাব্দীর শুরুতে সমকাল নাট্যাঙ্গন আয়োজন করে 'নাট্য উৎসব ২০০০'। এতে মোস্তফা থিয়েটার (১৯৯০) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরর নাটক 'ভাড়াটে চাই' সঞ্জিব জয় শোয়ালের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। মোস্তাফা থিয়েটার ২৯টি প্রযোজনার মোট ১০৭টি প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতিভা থিয়েটার (১৯৮৮) মঞ্চস্থ করে মালিক ফখরুদ্দিনের নির্দেশনায় আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'এখোনো ক্রীতদাস।' প্রতিভা থিয়েটারের তহবিলে সঞ্চয় আছে ১৪টি নাটকের ৪৮টি প্রদর্শনী।

নির্দেশক মালিক ফখরুদ্দিন সম্পর্কে শিব শংকর বলেন, 'মালিক ফখরুদ্দিন অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন। কী দুর্দান্ত তার অভিনয়। ভরাট কণ্ঠের অধিকারী ফখরুদ্দিন একেবারে নাটক পাগল লোক ছিলেন। সারাজীবন দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করেছেন। শাহজাহান হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন। দিনের বেলায় ম্যানেজারী করতেন। রাতে করতেন নাটকের রিহার্সেল।

ফখরুদ্দিন জীবনে ক্লিক করতে পারেননি। জীবনের খ্যাতি পরিচিতি প্রাচুর্যের সন্ধান তিনি পাননি। সবাই হয়তো পায়ও না। যদি পেতেন তাহলে আমি নিশ্চিত ফখরুদ্দিন দিয়েই আমরা

পরিচিত হতাম। সারাজীবন মফস্বল শেরপুরে থেকে গেলেন বলেই বোধহয় ভাগ্যের শিকা তাঁর ছিঁড়লো না।'

জামালপুর থিয়েটার (১৯৯৪) ২২টি প্রযোজনার ৫০টি শো মঞ্চের পাদপ্রদীপে আলোকিত। শাহীন রহমানের নাট্যরূপে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের 'সূর্বণ গোলক' মঞ্চস্থ হয় আলোক কুমার রায়ের পরিচালনায়।

সমকাল নাট্যাঙ্গনের প্রযত্নে চারদিনব্যাপী এই উৎসবে আয়োজক সংগঠন বিপুল দাম হৃদয়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করে 'রসে ভরা বঙ্গ দেশ'। সমকাল নাট্যাঙ্গন এই পর্যন্ত ৭টি প্রযোজনার ১৮টি প্রদর্শন করেছে। অধিকাংশ নাটকের পরিচালক ছিলেন সংগঠনের সভাপতি বিপুল দাম হৃদয়।

অন্য দুটির একটি পরিচালনা করেন শিব শংকর কারুয়া, আরেকটি দেব জ্যোতিসেন শর্মা। দেবজ্যোতি একজন দক্ষ নাট্যকর্মী। নয়ের দশকে লোকনাট্য দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। লোকনাট্য দলের প্রযোজনা 'কুঞ্জুস' নাটকের প্রধান চরিত্রে তিনি অভিনয় করে সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

টাউন শেরপুরে নাটকের কাগজ একটিই। নাট্যকর্মীদের নিজস্ব কাগজ থাকা জরুরি। সালাউদ্দিন মাহমুদের প্রচ্ছদে 'নাট্যপত্র' প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। শহীদ মোস্তফা থিয়েটারের মুখপত্র। সম্পাদক সুজয় মালাকার। ১৯৯০ সালের ৪ নভেম্বর নবীনগরে থিয়েটারের জন্ম হয়। নাটক বিষয়ক এটিই শেরপুরের প্রথম পত্রিকা।

যদিও টাউন শেরপুরে নাট্যচর্চার ইতিহাস দীর্ঘদিনের, নাটকের কাগজ বের করার কেউ উদ্যোগ নেয়নি। শহীদ মোস্তফা থিয়েটারের মুখপত্র বেশিদিন টিকেনি।

'নাট্যপত্র' বিষয়সূচি ছিল : 'শেরপুরের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত' রবী নিয়োগী,' ও ধীরেন হোড়ের 'আমাদের আমলে নাট্যচর্চা' ও বিমল কর্মকারের 'নাট্যাঙ্গনে আমি'।

শত বছরের টাউন শেরপুরের নাট্যচর্চার হদিশ যোগ্য কেউ একজন করবে, যতটুকু তথ্য-উপাত্ত পেলাম বিভিন্ন সূত্র তা টুকে রাখছি। 'মূলত শেরপুরে নাট্যচর্চা শুরু হয় ১৯০০ সালের প্রথম দশকে। চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার লিখিত একটি সংস্কৃত নাটকই সম্ভবত শেরপুরে প্রথম নাটক।'

মলয় মোহন বল লিখেছেন, 'বীনাপাণি নামের একটি নাট্য সংগঠন প্রথম দিকে কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করলেও, বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। সুহৃদ নাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পরই দীর্ঘদিন নাট্যচর্চা জারি রেখেছে।৩৪

দেশভাগ পূর্ব টাউন শেরপুরে নাট্যচর্চা স্থানিক জমিদারদের সাহায্য সহযোগিতায় গতিশীলতা পায়। এই সময়েই গঠিত হয় 'এ্যামেচার পার্টি'। মোহিনী মোহন বল টাউন শেরপুরে নাট্যচর্চার সিংহপুরুষ। নয় আনী বাড়ি জমিদারের আঙ্গিনায় তাঁর নির্দেশিত নাটক মঞ্চায়িত হয়।

বিমল কর্মকারের সৃজনী নাট্যগোষ্ঠী, জিকে স্কুলের ছাত্রবান্ধব নাট্য সংগঠন কমলা নাট্য সমাজ ফ্রেন্ডস স্টাফ ইত্যাদি সংগঠন নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

দেশভাগ উত্তর ষাটের দশকের শেষে গণ সংস্কৃতি সংসদ ও স্বাধীনতা উত্তর কৃষ্টি প্রবাহ, ত্রিসপ্তক, সন্ধানী শিল্পী গোষ্ঠী, শেরপুর নাট্য গোষ্ঠী, রাজহংস প্রোডাকশন হাউজ নাট্য চর্চায় টাউন শেরপুরকে রাখে উজ্জীবিত।

এ টি এম জাকির হোসেনের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় বিষের পেয়ালা, জীবন যন্ত্রণা ও নিয়তির খেলা। জাকির হোসেন নাটক পরিচালনা করা ছাড়াও লিখেছেন নাটক। গড়েছেন কবিতার সংগঠন। সম্পাদনা করেছেন একাধিক ছোটকাগজ এবং তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক চলতি খবর নয়ের দশকে তরুণ কবিদের ছিল কবিতাচর্চার চাতাল।

জাকির হোসেনের সমসাময়িক আরেক নাট্যজন বিজন চক্রবর্তী (১৯৪৬)। বাকরাসায় ১৯৬০ সালে গঠন করেন 'সৃষ্টি সাংস্কৃতিক সংসদ। স্বাধীনতা পূর্ব টাউনে হলে বিজন চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মঞ্চায়িত হয় 'আমিই ময়না' (১৯৬২), 'মুক্তি ডাক' (১৯৬৯) ও 'মুক্তি' (১৯৭০)।

এই তিনটি নাটকই তাঁর নিজের রচনা। বাকরাসা গ্রাম দেশভাগ পূর্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এই গ্রামেই বসত করতেন প্রখ্যাত পন্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার। এখানেই ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি 'চতুষ্পাঠী'।৩৪

বিজন চক্রবর্তীর এই গাঁয়েরই সন্তান। স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্রে সংযুক্ত হন। পরিচালক মীর হুমায়ন কবির ও রেজা হাসমতের সাথে কাজ করেন। কিন্তু নানা কারণেই টিকে থাকতে পারেননি, ফিরে আসেন শেরপুরে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার পরেই বিজন চক্রবর্তী 'রক্ত আগুন ধোঁয়া' নামে একটি চিত্রনাট্য লিখলেও, সেলুলয়েডে বন্দী করতে পারেননি। আর্থিক অক্ষমতা ও সাংগঠনিকতার অভাবে এই চিত্রনাট্য ট্রাঙ্কবন্দী। কাদের হেসেন মাকসুদ, নোমান, বাদশা, রাজামিয়া ছিল সৃষ্টি সাংস্কৃতিক সংসদের কর্মী—জানালেন বিজন চক্রবর্তী।

২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত রূপান্তর নাট্যগোষ্ঠী ২০১২ সালে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ করে 'মন্ত্রী হবার স্বপ্ন'—মমিনুর রহমান মিল্লাতের রচনায় ও আবু রায়হান পাভেলের পরিচালনায়। এ ছাড়া স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তিতে ভ্রাম্যমাণ পথনাটক 'রক্তের দামে কেনা' বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হয়।

আট

সম্পাদক ও কবি উদয় শংকর রতন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। কবি আরিফ হাসান লিখেছেন, '...এমনি একজন অবহেলিত কবি উদয় শংকর রতন। যৌবনের অফুরন্ত

প্রাণশক্তির সবটুকুই তিনি ব্যয় করেছেন সাহিত্যসেবায়। অকৃতদার এই কবি কবিতাকেই করেছেন জীবনসঙ্গিনী।'[১০]

তার জীবনযাপন সম্পর্কে আরিফ লিখেছেন, 'রতন দা রাজার মতো জীবনযাপন করেন।... দুপুর বারটায় ঘুম থেকে ওঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে ঘণ্টা খানেক দৈনিক পত্রিকার পাতা ওল্টান। ঘুমাতে যান ভোর রাতে।'[১০]

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নিসর্গের নীল খামে' (১৯৯১) এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'যা উড়ে যা কালো মেঘ' (১৯৯৮) এবং একটি কিশোর গল্প গ্রন্থ 'একজন মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান গল্প' (২০০৩)।

ইউরিনারি স্ট্রিকচারে ভুগে রতন আত্মহননের পথ বেছে নিলেন, ২০০২ সালে ২৫ মার্চ। উদয় শংকর রতনের কবিতা নিয়ে কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি। শুধু উদয় কেন সমসাময়িক কোনো কবিই অপর কবির কবিতা নিয়ে কোনো রিভিউ বা পর্যালোচনা করেছেন—এমন কোনো লেখা চোখে পড়েনি।

উদয় শংকর-সহ পথিক রবিন পারভেজের সাথে দীর্ঘকাব্য সখ্যভাব থাকলেও, রবিন উদয় শংকরের কবিতা নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। অগ্রজ কবি রণজিত নিয়োগীও তাঁর পূর্ববর্তী বা তার সমসাময়িক কিংবা অনুজের কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। তেমন কবি সুহৃদ জাহাঙ্গীর। যদিও প্রত্যেকে কবিতার প্রতি নিবেদিত। ছিল নিজস্ব কাগজ।

অপরাপর কবির কবিতা পর্যালোচনার সংস্কৃতি গড়ে না-ওঠার কারণে কবিতাও পল্লবিত হয়ে ওঠেনি। গোটা দেশের জন্য তো বটেই, স্থানিকতার জন্যও কথাটা খাটে। কাজে কাজেই শেরপুরে অজস্র কবি ও কবিতা জন্মেছে। আবার হারিয়ে গেছে।

স্থানিকতার বাইরে যাবার মতো কারো নিজস্ব স্বর উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। পর্যালোচনা ছাড়া স্থানিকতা গ্রাম্যদোষে দুষ্টই থেকে যাবে। স্থানিকের যে সৌন্দর্য তা বিকশিত হবার পথ পাওয়া যাবে না।

উদয় শংকর রতনের কয়েকটি কবিতার অংশ—

ক.

'একটা ঝড় উঠবে। ভীষণ ঝড়।
যে ঝড়ে উড়িয়ে নেবে সমস্ত পূঁজিপতিদের পূঁজি
যে ঝড়ে ভাসবে শুধু বিদীর্ণ মানুষের আত্মার ধ্বনি
আর্বজনার মতো উড়বে আকাশে,
এমন একটা ঝড় উঠবে?
(অশুভ সংকেত)

খ.

একদিন মরে পড়ে থাকব
চিৎ পটাং হয়ে
শেরী মহাশ্মশানে।
(মৃত্যু)

গ.

তুমি সব নাও
আমার শিল্প ও বিশ্বাস নাও
নাও আমার চেতনা ও সুখ
আমার কবিতাকেও নাও।
আমার হৃদপিণ্ড আর এই বসন্তে
আমার ক্ষয়িষ্ণু বৃক্ষের শরীর থেকে
বিবর্ণ পত্রের গান নাও
(নাও)

ঘ.

একটা দিন চাই—
রক্তরাঙা গোলাপের মতো
লাল টুকটুকে দিন—
(নিদেন পক্ষে একটা দিন)

নয়

'চিত্রশিল্পী ও কবি—এই যুগল সত্তা নিয়ে রণজিত নিয়োগী'র আত্মপ্রকাশ ষাটের দশকে। জন্ম ৭ নভেম্বর ১৯৪২ সালে। বাবা উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিপ্লবী, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সিংহপুরুষ কমরেড রবি নিয়োগী, মা কমরেড জ্যোৎস্না নিয়োগী—নারী মুক্তি আন্দোলনের নেত্রী, মানুষের সার্বিক মুক্তির সংগ্রামের অগ্রসৈনিক।

রণজিত নিয়োগীর সত্তরতম জন্মদিনে প্রকাশিত রবিন পারভেজের 'রা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় রবিন আরো লিখেন, 'যে বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কবি রণজিত নিয়োগীর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা, তা থেকেই সৃষ্ট তাঁর কবিতার মন। বাবার কবিতায় যে আহ্বান ছিল—' তোমাদের কবিতায় গানে আর ছবিতে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম আনন্দ-বেদনা ওঠে আসুক।

নিয়োগীর কবিতা সম্পর্কে রবিন বলেন, 'বিশ্বায়নের কারণে আজ আমাদের সংস্কৃতি যে অস্পষ্ট, জাতিসত্তা বিচ্ছিন্ন, ইতিহাস-ঐতিহ্যহীনতায় দাঁড়াচ্ছে—নিয়োগী তাতে সামিল হতে নারাজ। নিজস্ব রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিমূল বিবেচনা করেই বৈশ্বিক হয়ে উঠতে হয়—তাঁর কবিতায় আমরা এমন চেতনারই সাক্ষাত পাই।'

ক.

‘আকাশ মহল থেকে ভাসমান স্প্রিংয়ের দোলনায়
লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে তারা
বারবার উড়ছে তারা ইন্দ্রধনু ডানায় আকাশ
আর সর্বশেষ পৌঁছে যায় মহাকাশ উচ্চতায়।
ক্লাউন কিন্নর কণ্ঠ
কনসার্টের ফেনায় ফেনায় উচ্ছ্বসিত আলোর বুদ্বুদ
আউরে যাচ্ছে
মানুষের উন্নতির উজ্জ্বল পরিসংখ্যান
মাটি থেকে আকাশ আর মহাকাশ উচ্চতার
জটিল যোগফল।
(সার্কাস : রণজিত নিয়োগী)

ড. সুধাময় দাস লিখেছেন, ‘রণজিত নিয়োগীর অধিকাংশ কবিতাই একটানে পড়া যায় না। একাধিকবার থামতে হয়, ভাবতে হয় এবং ভেবে ভেবে এগুতে হয়। তাঁর কবিতায় মানব ইতিহাসের সমাজের সময় পরম্পরায় বিচিত্র উপাদানের সমাবেশ ঘটে।’[১১]

রণজিত নিয়োগী ‘মৃৎ’ প্রকাশ করেন ২০০৮ সালে। গোটা চারেক সংখ্যা উদীচী জেলা সংসদের ব্যানারে প্রকাশ পায়। ‘মৃৎ’ শিল্প-সাহিত্যের কাগজ। কবিতারই প্রাধান্য ছিল। প্রচ্ছদ নিজেই করেছেন। শেরপুরে যারা ব্লক বা প্রচ্ছদ করেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম।

তাঁর নিজের পত্রিকা বা রবিন পারভেজের ‘রা’ সবগুলো সংখ্যায় তিনি প্রচ্ছদ করেছেন। তাঁর রেখার গতি ও বিন্যাস একটি আলাদা মাত্রা আনে। পাঠকের নজর কাড়ে।

এখানে আরেকটু তথ্য দেয়া যেতে পারে। ১৯৭১ সালে কলকাতায় সংগঠিত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার কর্মকাণ্ডে চিত্রশিল্পী হিসেবে নিয়োগী যুক্ত হন। কবি বিষ্ণু দে সম্পাদিত ‘বাংলদেশের কবিতাগুচ্ছ’ সংকলনের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রণজিত নিয়োগী। ‘মৃৎ’-এ লিখেছেন—সুহৃদ জাহাঙ্গীর, রবিন পারভেজ, প্রাঞ্জল সাংমা, সুমন দাস প্রমুখ।

‘মৃৎ’-এ প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা তুলে দিচ্ছি :

ক.

... তবুও
বুকের দীর্ঘশ্বাস ছোট নয়
সংখ্যালঘু মন জানে দীঘল দীর্ঘশ্বাসের জ্বালা
আমার ভেতরে এসো
উপজাতের কষ্ট দেখাই
বুকটা ছিঁড়ে দেখো
জাত বেজাতের রক্ত দানায়
আমিও যে গাই বন্ধু
সোনার বাংলা গান।
(হৃদয়ের গান : প্রাঞ্জল সাংমা)

খ.

চোখের সমুদ্রে মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের
সমস্ত জল।
জল ঝড়ে, জোয়ার আসে;
বালুময় তীরে শামুকের মতো
নিস্পৃহ পড়ে থাকে
আমার বন্ধকী স্বপ্নের টিপসই।
(সমুদ্র বিলাস : কোহিনুর রুমা)

গ.

বিশ্বাস করো কিনা জানি নে
একদিন আমার এ বুকেও
তরতর করে বইতো উজানের নাও
ভাঙতো শহর-বন্দর-গাঁও।
(আমার এ বুকেও : লুল আবদুর রহমান)

ঘ.

আমাকে বাধা দিও না
আমি যাবো,
লাল ইটের সিঁড়ি মাড়িয়ে
ওই ফুলের সমাধিতে,
দেখব অশ্রু জমে জমে সাদা হয়ে গেছে
ফুলের শরীর।
(বাধা দিও না, আমি যাবো : আরিফ হাসান)

নিয়োগী তাঁর কাগজে কবি ও কবিতা নির্বাচনে একদিকে যেমন লেখার শিল্পের দিকে নজর দিতেন, তেমনি লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শের কী—সেই দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। রনজিত নিয়োগী তুলি ও কলম নিয়ে চিন্তার ‘কার্তুজ’ হৃদয়ে প্রথিত করে ঠিক ঠিক নিশানায় তাক করে রেখেছেন আধিপত্যবাদবিরোধী এক সমাজ বাস্তবতার অশ্রুত স্বাপ্নিক কার্যক্রম।

জাত-পাত শ্রেণি বিভেদ বিরোধীতার মনোভূমি নিয়োগীর এক অনিবার্য বৈপ্লবিক উত্তরাধীকার। যে বৈপ্লবিক পরিসরে কবি

রণজিত নিয়োগীর বেড়ে ওঠা; সেই প্রাতিবেশিক বলয়ে উত্তর উপনিবেশিক সময়ে আধিপত্যবাদবিরোধী হওয়া ছাড়া অন্যকোনো পথ নেই; বরং এক অনিবার্য অনুশীলন।

এই কার্যক্রমে নিয়োগী সতত হাজির ছিলেন। 'মৃৎ'-এ প্রকাশিত প্রাঞ্জল সাংমার কবিতায় তাঁর প্রাতিবেশিক জগৎ যেমন ওঠে এসেছে, তেমনি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক যাপনের সুর ও স্বর জেগে উঠেছে।

তবে মিঠুন রাকসাম প্রাঞ্জল সাংমার চেয়ে আরো ভেতরের অনুভূতিমালা তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায়। মিঠুন ঝিনাইগাতীর, প্রাঞ্জল শ্রীবর্দীর। দু'জনেই একই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থেকে উঠে এসেছে। যদিও শেরপুরের কাগজে মিঠুন রাকসামের কবিতা খুব একটা প্রকাশিত হয়নি।

ক.

'তখনও কি মান্দি নারী কাঠগড়ায়

চেঁচিয়ে বলছে, 'বাবু ও দলিল জাল...'

শুনতে পাই ট্রাকটরের শব্দ

মুখে পান গুঁজে ব্যাটা গান গাইছে

তাহলে কি সবই অসাড়?

মুছে যাবে এসিড পাতার ন্ম?

কিংবা 'পিরেন পিরেন?'

পাহাড়ি মাটির মত ক্ষয়ে যাবে দলিল?

(দলিলে ভাটপাড়া গ্রাম : মিঠুন রাকসাম)

'ব্রিংনি বিবাল'-এ প্রকাশিত মিঠুনের কবিতা। প্রকাশ ২০০৯।

খ.

'বৃদ্ধ নানীর সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি না।

নানী বাংলা জানে কম

আমি মান্দি জানি কম

মুখোমুখি বসে থাকি—বোবা হয়ে যাই।

শালার নিজের ভাষাটাও ভুলে গেলাম।

(গন্ধচোর : মিঠুন রাকসাম)

প্রাঞ্জল সাংমা, মিঠুন রাকসামদের আধিপত্যের চাপ ও তাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। তাদের কবিতায় এখন ক্রমেই উঠে আসছে প্রান্তজনদের কেন্দ্রীয় সুর।

দশ

শেরপুরে ছোটদের কাগজ তুলনামূলকভাবে কম হলেও, পাতাবাহার খেলাঘর আসর দীর্ঘদিন ধরে সৃষ্টিশীল কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। পাতাবাহারের প্রকাশনা 'প্রতিধ্বনি' সম্পাদক তুলশী নাগ। পঞ্চদশ সম্মেলন '৮৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ ও ব্লক করেছেন বিজন কর্মকার।

সত্তর আশির দশকে টাউন শেরপুরে যে সকল সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলো হয় রণজিত নিয়োগীর প্রচ্ছদ কিংবা বিজন কর্মকারের কাঠ খোদাইয়ের কাজ। তিনি 'প্রবাহ', 'মানুষ থেকে মানুষে', 'প্রতিধ্বনি' কিংবা তার নিজের কাগজ 'চেতনা'য় ব্লকে প্রচ্ছদ করেছেন।

সেই সময় লেটার প্রেসের যুগে কাঠের ব্লক করা এবং স্থানীয়ভাবে ছাপা কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। যদিও 'প্রতিধ্বনি'র প্রচ্ছদের রঙের বিন্যাস তেমনি করে ফুটে ওঠেনি।

তবে বিজনের পেন্সিল স্কেচ নিঁখুত। স্কেচ তার রক্তে খেলা করে। তাঁর সন্তান যেমন তার উত্তরাধিকার বহন করছে, তেমনি তিনি নিজেও। তাঁর পিতা মোহিনী মোহন কর্মকারও পেন্সিল স্কেচে ময়মনসিংহের উত্তর জনপদে একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন। যদিও মোহিনী মোহনের কোনো শিল্পকর্ম বিজন সংরক্ষণ করতে পারেননি।

সময়ের দাপটে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। 'চেতনা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। বিজন কর্মকারের প্রযত্নে।

'জন্মের পরই নাম হয়েছে আমার

আমি গণ বাংলার মানচিত্র'

(মানচিত্র : বিজন কর্মকার)

চেতনায় আরো লিখেছেন—এমেলী পারভেজ, গৌরি শংকর চক্রবর্তী, দেবেশ চন্দ্র দাস, মো. আবু তাহের প্রমুখ। বিজন কর্মকার পেশাগত কারণে স্থানান্তর হবার কারণে আর কোনো কাগজ করেননি। তবে জড়িয়ে ছিলেন 'কৃষ্টি প্রবাহ গোষ্ঠী'র সাথে।

পরবর্তী সময়ে তবলবাদক বিজন পাতাবাহার সংগঠিত কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন গত শতকের সাতের দশকের মাঝামাঝির দিকে। পাতাবাহারের জন্ম স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ১৪ অক্টোবর। দুলাল দে বিপ্লবের প্রযত্নে।

দুলাল গত শতব্দীর ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকেই সৃষ্টিশীল কাজে জড়িয়ে পড়েন। বিজন কর্মকার কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'দুলাল জি কে পাইলটের ছাত্র। সৃষ্টিশীলতার উল্লাসে উন্মাদ। দারুণ বক্তৃতা করতে পারতেন।' শুরুতে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে

জড়িয়ে পড়লেও, ছাত্র ইউনিয়নের ভেতর খুঁজে পেলেন ব্যক্তি সমাজ রূপান্তরের মতাদর্শ।

'পাখিটাকে ছেড়ে দাও।
বন্ধ খাঁচার আগল খুলে
সুনীল আকাশে জীবনের
অন্বেষা যেখানে
ওতো সেখানে ক্লান্ত নয় এতটুকু
অথচ এখানে ক্লান্তি
আহত বেদনায়
তোমার সুখের অনলে
(পাখি : বিপ্লব দে দুলাল)

এটি বিপ্লব দে দুলালের মুক্তিযুদ্ধে থাকাকালীন সময় লিখিত কবিতা। তারিখ ৩০/৮/৭১। রণাঙ্গনে দুলাল ডায়েরিতে প্রতিদিন কিছু-না-কিছু লিখতেন। তাই কিছু অংশ 'অঙ্গীকার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেই ছেলেটিকে আমি ভুলিনি—কোনোদিন ভুলব না। দুরন্ত তরুণ। সারা চোখে-মুখে কোমল লাবণ্য। ভীষণ কোমল। প্রশান্তির হাসি ওর মুখে। ও আমার কথার উত্তর দিচ্ছিল...'১২

পাতাবাহার থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন স্মরণিকায় শহীদ দুলাল দে'র চিঠি ও ডায়েরির কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে দুলালের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। দুলাল দে'র প্রতিষ্ঠিত পাতাবাহার নিশ্চয় তাঁর সাহিত্যকৃত্য প্রকাশ করবে।

ধন্য রাজা পূণ্য দেশ
সুখে আছি আমরা বেশ
খাইবা না খাই
নেইকো কোনো দ্বেষ
আমরা আছি সুখেই বেশ
ধনী গরীব। কিংবা দুখী
সবাই আমরা ভীষণ সুখী
সেই রাজাটি ভীষণ লাকী
সবার চোখে দিচ্ছে ফাঁকি
রাজার গুণে নেই কোনো কূল
ভেল্কি বাজির। সরষে ফুল।
(কোনো এক রাজার রাজ্যে : উদয় শংকর রতন)

ভোরের বেলায় পাখির ডাকে
ভেঙেছে আজি ঘুম
বেরুয়ে দেখি সবাই এখন
নীরব নিঝুম।
চুপটি করে ফুল তুলিতে
যাবো আমি আজি
চাঁদরখানা জড়িয়ে ধরে
ভুতুম পেঁচা সাজি।
(ফুল তুলি : তুলশী নাগ স্বপন)

এ ছাড়া লিখেছেন—সৌমিত্র শেখর, কমল চক্রবর্তী, শুকল সরকার প্রমুখ। তবে আমাদের প্রত্যাশা : দুলাল দে'র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলো সংগঠিত করে মলাটবদ্ধ করা, যেন এ-সময়ের পাঠক আরেকটু বিপ্লবকে জানতে পারে। বিপ্লব প্রতিরোধযুদ্ধে নিহত হন ১৯৭৫ সালে।

এগারো

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় 'কচিকাঁচা' নববর্ষ সংখ্যা। একটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। 'বৈতালিক কচিকাঁচা মেলা'র পক্ষে উৎপল কুমার ভৌমিক ও সাব্বির আহমেদ শাহরিয়ারের যৌথ সম্পাদনায়। মেলার পরিচালক ছিলেন এস জাহানারা ওয়াজেদ। বৈতালিকের কার্যক্রম বেশ কিছুদিন চললেও, আর কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।

১৯৮৮ সালে শিশু-কিশোরদের মুখপত্র হিসেবে হাজির হয় 'দুরন্ত'। সম্পাদক সুজয় মালাকার ও শহীদুজ্জামান। দ্বিমাসিক ঘোষণা হলেও, দুটো সংখ্যা বের হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। ছোটদের জন্য ছোটদের কাগজ হিসেবে 'দুরন্ত'কে গড়ে তোলার চেষ্টা সম্পাদকদ্বয়ের ছিল। কিন্তু বিকশিত হবার আগেই ঝরে পড়ে দুরন্তের দুরন্তপনা।

আম জাম কাঁঠাল লিচু
বাজারর বড় চড়া
আব্বা আম্মা আজকাল
হয়ে গেছে কড়া।
(ছড়া : শাহিনুর ইসলাম)

দুরন্তে ছিল গল্প, কবিতা, ছড়া, ভ্রমণ কাহিনী, অনুবাদ, শিশু স্বাস্থ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখা। ছিল 'ডাক পিয়নের ঝুলি' পাঠক ও সম্পাদকের চাপান উত্তর।

‘তোমার ছড়াটি পড়তে আমরা ভুল করিনি। তোমার চিঠিতে অনেক বানান ভুল। বানানের প্রতি যত্ন নিও।’

‘তোমার পাঠানো কবিতাটি পড়ে আমাদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। কবিতাটি মনে হয় আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত কবির লেখা। তাই আমরা ছাপাতে পারলাম না। ভবিষ্যতে স্বরচিত লেখা পাঠাবে।’

ছোট খুকি মিলি
আছে তার এক বুলবুলি।
বুলবুলির বিয়ে
সোনার মুকুট দিয়ে
বর এসেছে বর এসেছে
নিয়ে এসেছে গাড়ি
সেই গাড়িতে চড়ে বুলবুলি
যাবে শ্বশুড় বাড়ি।
(ছড়া : রেহেনা পারভিন)

একফর্মা নিউজপ্রিন্টে ছাপা দুরন্তের মূল্য ছিল ২ টাকা।

বার

‘শেরপুর শ্রমিক ক্লাব’-এর পক্ষে আবদুস সাত্তার জোয়ারদারের সম্পাদনায় বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় ‘সমর্পণ’। প্রকাশ কাল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সাল। ইউনুস প্রেস থেকে মুদ্রিত। বিনিময় মূল্য এক টাকা।

শ্রমিক শ্রেণিদের পক্ষ থেকে সাহিত্যচর্চা শেরপুরে সত্তর দশকে দেখা মিললেও, পরবর্তী সময়ে তার ধারাবাহিকতা থাকেনি। সম্পাদক লিখেছেন, ‘রুটিন বাধা জীবনে এই শ্রেণী কোনোদিন পায় না সংস্কৃতির আলো। তাই সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজে এদের স্থান নির্ধারণে শ্রমজীবীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে শেরপুর শ্রমিক ক্লাব।’

তিনি আরো লিখেছেন, ‘শ্রমিক জাতীয় জীবনের মূলশক্তি। এই শক্তি যদি সচেতনভাবে আলোক তীর্থে নিয়ে যাওয়া না যায়, তবে জাতীয় জীবন অবধারিতভাবে হবে অন্ধকারের উৎস। ইতিহাস যতটুকু অর্জন করেছে, মানুষ যতটুকু এগিয়েছে—তার মূলে আছে শ্রমিকদের সচেতন প্রয়াস। শ্রমিকের কর্মক্ষমতার মাঝে যদি আসে অবচেতন প্রয়াস—ইতিহাসে আসে বর্বরতার যুগ।’ সম্পাদকের চমৎকার পর্যবেক্ষণ।

আবুল হোসেন লিখেছেন, ‘শ্রমিক মালিক সম্পর্কের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ই উৎপাদন বন্ধের ধর্মঘট, ঘেরাও আন্দোলন, মালিকদের পাল্টা ব্যবস্থা লে-অফ। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায়, দেশ হয় ক্ষতিগ্রস্ত। কোম্পানির মালিক ক্ষতি পুষিয়ে নেন মূলধন অন্যত্র সরিয়ে, সরকার পুষিয়ে নেন অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে। শুধু পুষিয়ে নিতে পারে না শ্রমিক মেহনতী জনতা। যারা দ্রব্যমূল্যের প্রাথমিক শিকার।’

এ ছাড়া লিখেছেন—এখলাস উদ্দিন, দেবাশীষ কর, কাজী মাসুদ, সাদিকুর রহমান মিরণ প্রমুখ।

ক.
‘কখনো বস্তা মাথায়, কখনো হাতুরি
কখনো ফুটপাতে, কখনো বারান্দায়
বিরাম নেই, চাওয়া আছে; পাওয়া নেই।
না;
আর নয়—
বিপ্লব তোমাকে স্বাগতম।
(লাল সূর্য : আজাদ আলী)

খ.
কতবার আমি মিশতে চেয়েছি—
সেই মেহনতি জনতার সাথে
কিন্তু—পারিনি।
... ...
পারিনি মেহনতি জনতার সাথে
চিৎকার করে বলতে—
আমি বাঁচতে চাই।
(মেহনতী আত্মা : দেবাশীষ চক্রবর্তী)

পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সালে ১ মে প্রকাশিত হয় ‘প্রলেতারিয়েত’। শ্রমিক দিবসের স্মরণিকা। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের শ্রমিক শাখার অনিয়মিত মুখপত্র। সালমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে লেটার প্রেসে ছাপা। এ সংখ্যায় লিখেছেন—শেখ মাসুদ, কামাল খাজা, রবিন পারভেজ, জীবন চৌধুরী ও বৃতেন্দ্র মালাকার।

স্থানিক রাজনীতি দুই মেরুকরণের ফলে অন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়েছে। অন্যদিকে. শিল্প-সাহিত্যচর্চা ও চর্যার পরিসরে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে গেছে। আশির দশক পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনগুলো বিভিন্ন দিবস বা দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের রীতিনীতি জারি রেখেছে।

তরুণদের সাহিত্যচর্চার আবাদী চাতাল হচ্ছে স্থানিক দিবসভিত্তিক স্মরণিকা ভাঁজপতা। সৃষ্টিশীল মানুষের আঁতুরঘর। নয়ের দশকের শেষে এই প্রবণতা ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে এখন দশা করুণ। মরুভূমি।

১৯৮০ সালের ২১ জুলাই 'শহীদ কর্নেল আবু তাহের স্মরণে' প্রকাশিত হয় 'বিস্ফোরণ'। জাসদ ছাত্রলীগ তাহের স্মরণে প্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জন্ম। 'রাজনৈতিক অস্থিরতা বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও হটকারিতার ভেতর যখন দেশের রাজনীতি পাক খাচ্ছিল তখন ট্রাইবুনালের রায়ে ফাঁসি হয় কর্নেল তাহেরের।' বিস্ফোরণের সম্পাদক ছিলেন কবির উদ্দিন আহমেদ।

খন্দকার মুজাহিদুল হক তাঁর 'একজন তাহের : আমরা তার উত্তরাধিকার' নিবন্ধে লিখেছেন, 'তাহের যখন সেনাবাহিনীতে ছিলেন, তখনই সেনাবাহিনীর বনেদী ভূমিকাকে নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছিলেন সেনাবাহিনী হবে সাধারণ মানুষের বন্ধু, মুক্তি আর প্রগতির সহযাত্রী এবং উৎপাদন ও সমৃদ্ধির প্রতীক।'

ক.

'মেরেছো যারে সেও তাহের—

আমিও তাহের

কর্নেল তাহের'

(রবিন পারভেজ)

খ.

না, শুনব না সামাজিকতা কোনো—দোহাই তোমার;

আমি অগ্নিগীরির মিতা।

আমি গরিলার বন্ধু—সিংহের দোস্ত—হতে পারি

আমার আগমন

তোমার ধ্বংশের অভিপ্রায়।

(সঞ্জীব চন্দ বিল্টু)

'এদেশ সৃষ্টির জন্য আমি রক্ত দিয়েছি। আর সেই সূর্যের জন্য আমি প্রাণ দেবো—যা আমার জনগণকে আলোকিত করবে, উজ্জীবিত করবে। এর চাইতে বড় পুরস্কার আমার জন্য আর কী হতে পারে। আমাকে কেউ হত্যা করতে পারবে না। আমি আমার সমগ্র জাতির মধ্যে প্রকাশিত। আমাকে হত্যা করতে হলে সমগ্র জাতিকে হত্যা করতে হবে। কোনো শক্তি তা পারে? কেউ পারবে না।' জেল থেকে শেষ চিঠি : তাহের। ২১ জুলাই ১৯৭৬। ভোর চারটা। ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। কর্নেল তাহেরের 'শেষ চিঠি' খুবই গুরুত্বের সাথে ছেপেছে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ঝাণ্ডা উড়িয়ে জাসদের আবির্ভাব হলেও, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ডামাডোলে জাসদের রাজনীতি বিকশিত না-হয়ে বরং অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্রমশ ব্র্যাকেট বন্দী হতে হতে শেষ পর্যন্ত অন্য দলের লেজুড়বৃত্তিই তাদের আরাধ্য হয়ে পড়ল।

যদি বাহাত্তরে সবচেয়ে প্রাগ্রসর তরুণেরই বাংলাদেশ রূপান্তরের জন্য দার্শনিকভাবে যেমন লড়েছে, তেমনি রাজনৈতিকভাবেও লড়েছে। স্থানিক রাজনীতিতে জাসদ-বাসদের কিংবা কমিউনিস্ট হোক সে চীনপন্থী বা রুশ অথবা অন্য কোনো বাম রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলো সংগঠিত হলেও, তাঁদের চিন্তার বিস্তার ঘটাতে পারেনি।

যদিও মেধাবী তরুণের সমাবেশ দেখেছি আমি। জাসদ-বাসদের দার্শনিক রাজনৈতিক স্ট্যান্ড যদি চর্চিত হবার স্পেস পেতো, তবে সৃষ্টশীল গদ্য-পদ্যের বিকাশের ধারা বিস্তার ঘটত কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য, স্থানিকে চিন্তাচর্চা করবার স্পেস গড়ে উঠেনি।

জাসদ প্রতিষ্ঠার পর পরই শেরপুরে জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ক্রমেই স্কুল-কলেজগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। সাহিত্যপত্র প্রকাশের ভেতর দিয়ে তরুণদের মাঝে সাংস্কৃতিক চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে পারেনি। তেমনি খুব বেশিদিন তৎপরতাও চলেনি।

'লাল আহ্বান' ৭ নভেম্বর সিপাহী গণ-অভ্যুত্থান দিবসে এই স্মরণিকা প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। স্কুল-কলেজভিত্তিক কবিতা লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারিদের নিয়ে এই স্মরণিকা।

আরো ছিল সঞ্জীব চন্দের '৭ই নভেম্বর'; এম আলমগীরের 'রাজনীতি প্রসঙ্গ'; মো. কাইউমের 'কর্তব্য প্রসঙ্গে' ও মুজাহিদুল হকের 'অনিবার্য কথন।'

সম্পাদক জি এম আজফার তাঁর সম্পাদকীয়ে লিখেছেন, হাজার বছর ধরে নিরন্ন নিষ্পেষিত মানুষের সীমাহীন বেদনায়, বাংলার আকাশে যে ঘন কালো মেঘ জমাট বাধছিল, তারই ধমনীতে যে অকস্মাৎ বিদ্যুতের ধারা বয়ে গিয়ে, প্রচন্ড বজ্রনাদে সমস্ত কালো আকাশ বরফের মতো গুড়ো গুড়ো হয়ে, বৃষ্টির আকারে নিরস মাটির দিকে ধেয়ে আসতেই শুরু হলো আরেক বাতাস—মানুষের আশার আকাশে দানবের পাখা ঝাপটানি।'

<u>তের</u>

সম্পাদক আবদুর রেজ্জাকের সম্পাদনায় জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর জিয়াউর রহমানকে নিয়ে প্রকাশিত হয় বিশেষ 'স্মরণিকা'। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা শেরপুর জেলা শাখার প্রযত্নে প্রকাশিত এই স্মরণিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন খন্দকার আবদুল হামিদ। প্রচ্ছদ করেছেন এম এ মান্নান।

লিখেছেন—সৈয়দা সানজিদা মনিকা, খন্দকার মোহছেনা আখতার ও শাহ মো. আবদুল আজিজ। কবিতায়—কাজী মতিউর রহমান, গঙ্গেশ চন্দ্র দে, রবিন পারভেজ, সাদিকুর রহমান মিরন ও আবদুর রেজ্জাকের দীর্ঘকবিতা।

'যে জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটেনা সে জাতির সংস্কৃতির মুক্তিও ঘটতে পারে না। যার জন্য একটা সুষ্ঠু জাতি

হিসেবে পরিচয় ঘটতে পারে না। যে দেশের সংস্কৃতি যত উন্নত সে জাতি তত সভ্য এবং উন্নত' লিখেছেন আবদুর রেজ্জাক। ১৯৮২ সালের ২১শের সংকলনের সম্পাদকীয়ে।

'উচ্চারণ' জাসাসের অনিয়মিত কাগজ। কবি রেজ্জাকের কবিতা নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ আলোচনা করেননি। আবদুর রেজ্জাক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

মত ও পথের ভেদ এবং পথ চলা নিয়ে স্থানিক পর্যায়ে কোনো আলোচনা বা সমালোচনার জন্য সেমিনার শেরপুরে দেখা যায়নি। শুধু শেরপুর কেন—এমন অবস্থা বাংলাদেশের সাধারণ দৃশ্য।

কেন্দ্রের বাইরে পরিধি কেবল ভোক্তা—শ্রোতা সত্তা নিয়েই হাজির থেকেছে, কখনো উৎপাদক—কর্তা সত্তা হিসেবে নিজেকে জানান দেয় নাই। প্রতিটি স্থানিকের যে রঙ মেজাজ মর্জি আলাদা—এক রূপতার আড়ালে সবকিছু দৃশ্যের উপারে চিহ্নের আড়ালে চলে গেছে।

ব্যক্তিমাত্রই কোনো-না-কোনো দর্শন দ্বারা পরিচালিত। ব্যক্তির মত ও পথের প্রতি সম্মান এবং পারস্পরিক আলোচনার ভেতর দিয়ে যে সহাবস্থান একটা সুন্দর সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত—কথাটি বইয়ে পড়তে, বলতে বেশ নিজেকে গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক লাগে; বাস্তবতা হলো আমরা তেমন 'কৃষ্টি-কালচার' তৈরি করতে পারিনি।

নয়ের দশকের শুরুর দিকে আবদুর রেজ্জাক 'কালিক' নামে একটি ছোটকাগজ প্রকাশ করেন। শেরপুর সাহিত্য পরিষদের ব্যানারে। তিনি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে একাধিক কাগজ সম্পাদনা করেন। কোনোটিই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।

আবদুর রেজ্জাক ও গঞ্জেশ দে'র যৌথতায় 'সৃজনী' নামে আটের দশকে একাধিক স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। অগ্রজ এই দুই লেখককে নিয়ে কাউকে কথা বলতে শুনিনি। এখানকার তরুণেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রেজ্জাক বা গঞ্জেশ দ্বারা কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত।

যদিও দুজনেই স্থানিক সাহিত্যচর্চার মাঠকে বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় কর্ষণ করে গেছেন। রেজ্জাকের একাধিক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে পরবর্তী দশকের কোনো তরুণই কী মৌখিকভাবে, কী লিখিতভাবে—কোনো কথাই বলেননি। যদিও অগ্রজ কবির পাঠ-মোকাবেলা করেই তরুণকে পথ নির্মাণ করতে হয়।

আবদুর রেজ্জাক সম্পাদিত সাপ্তাহিক শেরপুর (১৯৮৬) এই অঞ্চলের তরুণদের কবিতাচর্চার প্রশস্ত চাতাল হিসেবে দীর্ঘদিন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে; তেমনি আবু বকরের সাপ্তহিক দশকাহনীয়া (১৯৯১) ও জাকির হোসেনের সাপ্তাহিক চলতি খবর। এই তিনটি সাপ্তাহিক ও সম্পাদকত্রয়ের প্রতি আমার অশেষ ঋণ। গত শতাব্দীর নয়ের দশকে এই সাপ্তাহিক তিনটি ছিল আমার কবিতাচর্চার একমাত্র চাতাল।

জাকির হোসেন ষাট-সত্তর দশকের শক্তিমান অভিনেতা। সুবক্তা। ১৯৭৮ সালে 'সাহিত্য কলতান' প্রকাশ করে 'বিজয় কেতন'। সম্পাদক জাকির হোসেন ছিলেন কলতান সাহিত্যগোষ্ঠীর প্রধান সম্পাদক। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

'সাহিত্য কলতানে' সে সময় যুক্ত ছিলেন—দীপক ভট্টার্চায, মানিক নাগ, নারায়ণ চক্রবর্তী, নির্বাহী সম্পাদক দেবাশীষ চক্রবর্তী, কমল চক্রবর্তী ঝুনু, মহিলা সম্পাদক মনিকা চক্রবর্তী দেবী ও সাহিত্য সম্পাদক বাদল দাম প্রকাশ।

'বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' জাকির হোসেন লিখেছেন, 'একটা দেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গেলে সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজ সংস্কার, আচার আচরণ, প্রথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পর্যালোচনা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি ও তার ক্রমবিকাশ ও স্বকীয়তা নির্ধারণ করতে হলে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি, জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, ভৌগোলিক অবস্থান ও সমকালীন সমাজ জীবনের উপর আলোকপাত আবশ্যক।'

'বিজয় কেতন'-এর কোনো বিনিময় ছিল না। ১৯৮১ সালেও তিনি সম্পাদনা করেন 'অন্বেষা।' এটিও কলিতে ঝরে যায়। স্থানিক কাগজচর্চার এটি একটি সাধারণ নিয়তি। যে আবেগ ভালোবাসা নিয়ে তরুণ কবিযশ প্রার্থীরা দলবদ্ধ হচ্ছে, একটি বা দুটি প্রকাশ করে পত্রিকা যেমন বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯৭৯ সাল ৪ জানুয়ারি শেরপুরের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিন শেরপুর অঞ্চল মহকুমার শুভ যাত্রা শুরু হয়। টাউন শেরপুরে পৌরসভা হবার ১০৯ বছর পর টাউন শেরপুরে মহকমার সদর কার্যালয় স্থাপন করা হয়। নিশ্চয় দিনটি শেরপুরবাসীর আনন্দিত হবার দিন।

এ কে এম আহসান উল্লাহ, প্রথম মহকুমা প্রশাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় দিনটির স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয় জাকির হোসেনের সম্পাদনায়। সম্পাদনা পরিষদে আরো ছিলেন—সৈয়দ আব্দুল হান্নান, মুহম্মদ আবু তাহের ও গোলাম রহমান রতন।

এই স্মরণিকায় চমৎকার কয়েকটি গদ্য প্রকাশিত হয়েছে। জাকির হোসেনের 'শেরপুর ইতিবৃত্ত', গোলাম রহমান রতনের 'শেরপুরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি', গঞ্জেশ দে'র 'শেরপুরের লোকগীতি', সুনীল বরণ দে'র 'শেরপুরের গারো সংস্কৃতি' ও পন্ডিত ফসিহুর রহমানের মহকুমা শেরপুরের হাল নাগাদ তথ্য সংবলিত নিবন্ধ।

চৌদ্দ

'উচ্চারণ' শেরপুর পাবলিক লাইব্রেরির সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে। সম্পাদক মুহম্মদ মুহসীন আলী। এটিই পাবলিক লাইব্রেরির প্রথম সাহিত্যপত্র। জেলা প্রশাসক ম. শফিউল আলমের প্রযত্নে সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন—এস জাহানারা ওয়াজেদ, মুহম্মদ আবু তাহের, সুনীল বরণ দে, গঞ্জেশ দে ও জাকির হোসেন।

মুহসীন আলী লিখেছেন, ‘সমকালীন চিন্তা চেতনার পরিপুষ্ট হৃদয়ের অনুভূতিকে আঁকড়ে ধরে বিন্যাস ব্যঞ্জনার অনুরণনে জীবনের বাঙ্ময়তায় প্রকাশ-প্রয়াস সাধ্য তো বটেই; ব্যস্ত জীবন যন্ত্রণার সুতীব্র দাহনে বিগন্ধ হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দেয়া কষ্টসাধ্যও। তবু ‘মনের খোরাক জোগাড় করিতে যাইয়া পেটের খোরাকে টান’ পড়লেও বিদগ্ধজনেরা যুগে যুগে ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ হৃদয়-চেতনার জারকে সোনার ফসল উপস্থাপনা করে থাকেন; আর সমাজ ও জাতির সামনে তোলে ধরেন সমকালের কথকতা।’

এই কথকতা ‘উচ্চারণে’ উচ্চারিত। শেরপুরে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রের মাঝে এটি অনন্য। লেখা নির্বাচনে সম্পাদক সচেতন ছিলেন। মুহসীন আলী গত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকার সাথে জড়িত যেমন ছিলেন, তেমনি প্রগতিশীল আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের চর্চা ও চর্যার ক্ষেত্রে শেরপুরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘বাণী বিচিত্রা’ (১৯৫৭), গণবার্তা (১৯৭২)-সহ বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা কাজে জড়িত ছিলেন। যদিও পত্রিকাগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্থানিক ব্যক্তি উদ্যোগে প্রকাশিত ছোটকাগজের এই এক অনিবার্য নিয়তি। সম্পাদকদের উদারতা, কবি লেখকদের সক্ষমতা, পাঠকের আগ্রহ এবং অন্যদিকে স্থানীয় আর্থসামাজিক পরিকাঠামোও অনেকাংশ দায়ী।

মুহাম্মদ মুহসীন আলী মোজাম্মেল হক ও সুশীল মালাকারদের প্রজন্ম নানা প্রতিকূলতার ভেতরও ছোট কাগজ প্রকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকতা চর্চা করেই মূলত পরবর্তী সময়ে প্রজন্মের জন্য পথ নির্মাণ করে গেছেন।

শেরপুরে পাঠাগার চর্চার ইতিহাস শেরপুর অঞ্চলের সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তি পরিগঠিত হবার সময় থেকেই সম্পৃক্ত।

অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন নয়আনীর বাড়ীর ‘হেমাঙ্গ লাইব্রেরি’ সম্পর্কে উদ্বৃত্ দিয়েছেন Gazetteer of the mymensingh district থেকে। ‘The 9 ana bari contains a library which boasts of some manuscripts 500 years old.’[১৩]

অন্যদিকে, পৌন তিনআনীর জমিদার সতেন্দ্র মোহন চৌধুরীর মাতা হিরন্ময়ী দেবীর নামে নিজ বাড়িতে ‘হিরন্ময়ী লাইব্রেরি’ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪] এই পাঠাগারের বিস্তার ঘটান তাঁর পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত জি কে স্কুলেও পরবর্তী সময়ে কৃষি বিদ্যালয়ের পাঠাগার স্থাপন করে।

এই তথ্যগুলো শেরপুরে জারি আছে। শেরপুর নিয়ে যারা কাজ করেছেন, প্রত্যেকেই এই তথ্য হাজির করেছেন। ‘জয় কিশোর লাইব্রেরি’ নামেই একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার তথ্য পাই। কিন্তু কে বা কারা এই প্রান্তিকে উদ্যোগ গ্রহণ করল বা কোথায় পাঠাগারটি ছিল তা জানতে পারিনি। এখানে উল্লেখ্য যে, জমিদার সতেন্দ্র মোহন চৌধুরীর মাতা হিরন্ময়ী দেবী কবি ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম ‘পুষ্পাধার’।[৭]

রাজবাড়ির অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা পাঠাগারে স্বাভাবিকভাবেই সর্বসাধারণের প্রবেশের সুযোগ ছিল না। পরিবারবর্গের পঠন-পাঠনের সুন্দর বিন্যাস বটে। জমিদারদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা দেখি নিশ্চয় এই পাঠাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে সর্বসাধারণের পঠন-পাঠনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ‘রিডিং ক্লাব’।[১৪] সময় ১৯২৬। কে বা কারা রিডিং ক্লাব প্রতিষ্টা করল তা বিজয় কৃষ্ণ নাগ লিখেননি। তিনি তাঁর ‘নাগবংশের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘এখানে মাসিক চাঁদা দিয়া সর্ব্বসাধরনে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজাদি ও নানা প্রকার বই পাঠ করিতে পারে এবং ডিপোজিট দিলে পুস্তকাদি বাড়ী লইয়াও পাঠ করা যাইতে পারে।’[১৪]

সেই রিডিং ক্লাবের ধারাবাহিকতার ফসল আজকের জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার। ১৯৯১ সালে রাজস্বখাতে যুক্ত হয়ে পাঠাগারটি নামফলকে ‘খান বাহাদুর ফজলুর রহমান জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার’ হিসেবে উল্লেখ থাকলেও, সরকারি কাগজপত্রে ‘জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার’ হিসেবে চিহ্নিত।[১৫]

সমগ্র শেরপুর জেলায় বর্তমানে ২৮টি নিবন্ধিত পাঠাগার রয়েছে, জানালেন গ্রন্থাগারিক সাজ্জাদুল করিম। পাঠাগারের তৎপরতা আরো সম্প্রসারণমূলক সেবায় তিনি যুক্ত করেছেন নানামুখী কার্যক্রম। ২০১৯ সালের জুলাই থেকে প্রতি মাসের প্রান্তিকে আয়োজিত হচ্ছে ‘সাহিত্য আড্ডা ও চা চক্র’। এই আড্ডায় শেরপুরের কবি-সাহিত্যিকেরা অংশগ্রহণ করছেন।

সাজ্জাদুল করিম জানালেন, ‘পাঠকের সাথে যুগসূত্রের পরিসর সৃষ্টি করে একটি সাহিত্যপত্রিকা। পাবলিক পাঠাগারে নিয়মিত একটি সাহিত্যপত্র থাকার প্রয়োজনীতা রয়েছে।’

‘উচ্চারণ’ প্রকাশের বহুদিন পর জেলা প্রশাসক মো. নাসিরুজ্জামানের প্রযত্নে এই পাঠাগারে গঠিত হয় ‘শেরপুর সাহিত্য কেন্দ্র’। হাকিম বাবুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘ধ্বনি’ (২০১০)।

হাকিম লিখেন, ‘ধ্বনির স্বভাবই যেমন ধ্বনিত হওয়া, জানান দেয়া চারপাশকে; আমরাও নতুন প্রজন্মকে জানান দিতে চাই—জানিয়ে দিতে চাই এই বলে যে, নিজেকে শুদ্ধ, পরিশীলত এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়তে বইয়ের বিকল্প নেই। পণ্য সভ্যতার এই আবিলময় যুগে আকাশ সংস্কৃতির করালগ্রাসে আমরা আজ দিশেহারা। এর থেকে বেরিয়ে আসার বড় একটি রাস্তা হচ্ছে পাঠ এবং পাঠ্যাভাস।’

খান বাহাদুর ফজলুর রহমান সরকারি গণগ্রন্থগারকে কেন্দ্র করে সাহিত্য কেন্দ্রের পথ চলা শুরু হলে তার ধারাবাহিকতা থাকেনি। বন্ধ হয়ে গেছে ‘ধ্বনি’। বিশ্বসাহিত্যে কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচি এখন জেলা শহরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ‘দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি’ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।[১৫]

এখানে একটি তথ্য যুক্ত করা যেতে পারে, ‘১৯৭৯ সালে পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক লুৎফর রহমান মোহনের প্রচেষ্টায় শেরপুরে একটি স্মরণীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়।’[১৬]

আবু তাহের তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'সেই অনুষ্ঠানে—যতীন সরকার, ড. সনজিদা খাতুন, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, নির্মলেন্দু গুণ, আসাদ চৌধুরী, কাজী রোজী ও ইমদাদুল হক মিলন উপস্থিত ছিলেন।' সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ আবু তাহের।

তিনি লিখেছেন, 'কোনো গান-বাজনা নয়, শুধু কবিতা শোনার জন্য উপচে-পড়া শ্রোতার ভীড় দেখে অতিথিরা তাঁদের ভাষণে বিস্ময় প্রকাশ করেন।'[১৬]

সেই যাই হোক। পাবলিক লাইব্রেরির 'উচ্চারণ' প্রসঙ্গে কথায় কথা বাড়ল। উচ্চারণের সূচিপত্র তুলে দিচ্ছি :

প্রবন্ধ

ড. আলী আসগর : ভাষার শরীক যে জন

গোলাম সামদানী কোরায়শী : ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী : রবীন্দ্র বিদ্রোহের স্বরূপ

যতীন সরকার : শহীদ বুদ্ধিজীবীর উত্তরাধীকার

কবিতা

সুকুমার বড়ুয়া, আল মুজাহিদী, সাযযাদ কাদির, উদয় শংকর রতন, সুনীল বরণ দে, গঙ্গেশ দে মুশতাক হাবীব, আপেল মাহমুদ

গল্প

আরেফিন বাদল, খালেদা রায়হান, মোস্তফা কামাল, মুহাম্মদ মুহসীন আলী

গীতিনাট্য

প্রদীপ কান্তি মজুমদার : বর্নমালার গাথা

উপন্যাস : অনুবাদ Albert camus-এর outsider

মুহাম্মদ আবু তাহের : ভিনদেশী

নবীনদের পাতা

সৌমিত্র শেখর দে : রবীন্দ্রনাথ : নজরুলের প্রেরণার উৎস

মলয় মোহন বল : কিশোর বিজ্ঞান আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক কথা

এ ছাড়া লিখেছেন—শিব শংকর কারুয়া, মালবিকা লাবনী, পরিমল চক্রবর্তী, রিয়াজুল হাসান সম্রাট প্রমুখ

পনেরো

মামুন রাশেদের সম্পাদনায় 'প্রয়াস' প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। এটি উত্তরায়ণের দ্বিতীয় প্রকাশনা। দি নিউ প্রেস থেকে মুদ্রণ। ব্লক করেছেন আব্দুল কুদ্দুস। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত শেরপুরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে উত্তরায়ণ গঠিত হয় গত শতাব্দীর আটের দশকে। সেই সংগঠনেরই মুখপাত্র 'প্রয়াস'।

সেই সময়ে আরেকটি সংগঠনের আর্বিভাব ঘটে 'আবাহন' নামে। তাদের একটি ছোটকাগজ ছিল 'বৈশাখী' (১৯৮৩)। সেটি হাতে পাইনি। এ ছাড়া খুঁজে পাইনি সৌমিত্র শেখরের 'রবি রশ্মি' (১৯৮৩)।

এই দশকেই প্রকাশিত হয় মামুন রাশেদ ও মুজাহিদুল ইসলাম মন্টুর যৌথ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক কাগজ 'কবিতাপত্র' (১৯৮৩) এবং মন্টুর একক সম্পাদনায় 'বিজ্ঞাপনপত্র'।

এই দশকেই প্রকাশিত হয় আবদুর রহিম বাদলের সাপ্তাহিক শেরপুর বার্তা (১৯৮৭), এখলাস উদ্দীনের শেরপুর তরঙ্গ (১৯৮৭), আবদুর রেজ্জাকের সাপ্তাহিক শেরপুর (১৯৮৬), জাকির হোসেনের সাপ্তাহিক চলতি খবর, আবু বকরের সাপ্তাহিক দশকাহনীয়া (১৯৯১)।

'বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা যখন শেরপুরে ছুটিতে বাড়ি আসে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। যেমন—সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটক, সিনেমা প্রর্দশনী, স্বেচ্ছায় রক্তদান, খেলাধুলা, রচনা প্রতিযোগিতা আর বিশেষ করে গুণিজন সংবর্ধনা'[৭]

নৃত্যশিল্পী কমল পাল লিখেছেন, 'একবার 'আবাহন' বিশিষ্ট আইন গ্রন্থপ্রণেতা আইনজ্ঞ গাজী শামসুর রহমানকে এবং সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদকে 'উত্তরায়ন' গোষ্ঠী সন্মান জ্ঞাপন করেন।'[৭]

আটের দশকে যারা ছোটকাগজ করেছেন প্রত্যেকে কাগজের বিন্যাস লেখা নির্বাচনে যথেষ্ট সর্তক ছিলেন। আটের দশক শেরপুরে ছোটকাগজচর্চার অভিমুখ ও তার কর্মতৎপরতা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় অনেক বেশি শৈল্পিক ও সংগঠিত। তার মধ্যে 'মানুষ থেকে মানুষে' অন্যতম।

'প্রয়াস'-এর সূচিপত্র : প্রবন্ধ-সাহিত্যে শেরপুরের অবদান/ মোস্তফা কামাল, বিবেকের সংকট/ মুশতাক হাবীব। গল্প লিখেছেন মামুন রাশেদ। কবিতা লিখেছেন—বাবলী জাহান, রোমান জাহান, শামীম ফারুক, মাসুদ প্রমুখ।

শেরপুরে প্রকাশিত সব কাগজ ছাপাখানার ভুতে পেলেও, মামুনের কাগজটি কোনো ভূতের আছড় পড়েনি। তাই বানান বিভ্রাটও ঘটেনি। প্রচ্ছদও আকর্ষণীয়।

মামুনের আরেকটি চমৎকার কাজ 'বিষণ্ন সৈকতে ভোরের নোঙর' (১৯৮৪)। শেরপুর ছাত্রলীগ জেলা শাখার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত।

মামুন রাশেদ লিখেছেন, '...এ যুদ্ধ মৃত্যু থেকে জীবনের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ রক্ত দিয়ে সূর্য গড়ার যুদ্ধ; সে সূর্য ছুঁয়ে যাবে ক্লান্ত কেরানীর ছেঁড়াশার্ট, পরিশ্রান্ত শ্রমিকের বিন্দু বিন্দু ঘাম, মোড়ের উলঙ্গ ছেলেটার জীবন। শোষণ যেখানে তীব্র, প্রতিরোধ সেখানে প্রখর;... তবু স্বপ্ন বেঁচে থাকে। শোষিতের মুক্তির স্বপ্ন—স্বপ্ন সমাজতন্ত্রের। বিকল্প যেখানে নেই, প্রতিরোধই সেখানে উত্তর।'

এ সংখ্যায় আরো লিখেছেন—নির্মলেন্দু গুণ, তাপস কুমার, সৌমিত্র শেখর দে, শামীম আহাম্মেদ ও আবদুল খালেক।